১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জন্ম ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ইং মৃত্যু ঃ ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ ইং

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর'৮৩ স্মরণে

Dashai November'83 Shmarane

প্রকাশকাল ঃ
১০ই নভেম্বর ২০০০ইং

Published on :
10 November 2000

প্রকাশনায় ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Published by :
Department of Information & Publicity
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
পার্বত্য চট্টগাম জনসংহতি সমিতি
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
টেলিফোন ঃ +৮৮০-৩৫১-৩০৯৪
ই-মেইল ঃ pcjss@abnetbd.com

Postal Address :
Department of Information & Publicity
Central Office
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti
Kalyanpur, Rangamati
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Tel : +880-351-3094, Fax +880-351-3284
E-mail : pcjss@abnetbd.com

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

Price : TK. 30.00

সম্পাদকীয়

আজ ১০ নভেম্বর ২০০০ সাল। ঠিক এই দিনে ১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, অধিকারকামী শোষিত মানুষের পরম বন্ধু, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ওরফে মঞ্জু জাতীয় কুলাঙ্গার বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের অতর্কিত হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে শাহদাৎ বরণ করেন। তাই এই দিন জুম্ম জনগণের একাধারে জাতীয় শোক ও চেতনার দিন। আমরা আজ তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। জানাই সশ্রদ্ধ সংগ্রামী লাল সালাম।

আজকের এই শোকাবিভূত দিনে পাশপাশি স্মরণ করছি সেই বীর সহযোদ্ধাদের যারা দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে চলা আন্দোলন সংগ্রামে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের অমূল্য জীবন দান করে গেছেন। আরও স্মরণ করছি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনের কারণে কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব জীবন বরণ করেছেন যে সকল মুক্তিপাগল বীর সহযোদ্ধা, পাশবিক ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন যে সকল নারী ও শিশু, আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন যে সকল শহীদ পরিবার-পরিজন তাদের মহান ত্যাগ-তিতিক্ষাকে। তাদের সকলের প্রতি জ্ঞাপন করছি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা।

এই জাতীয় শোকবহ দিনে আপামর জুম্ম জনগণ বিপ্লবী চেতনায় উদীপ্ত হয়ে উঠে - যে চেতনায় প্রিয় নেতা এম এন লারমা জুম্ম জনগণকে জীবনপন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে লৌহ-কঠিন ঐক্যে সমবেত হতে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। যে মন্ত্র শাসক-শোষকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আত্মবলিদানের দীপ্ত শপথ নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহান আদর্শ শিখিয়ে গেছে সেই অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রতিটি স্তরে আমরা দেখতে পাই বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘৃন্য প্রতিবিপ্লবের। যুগে যুগে নানা ধঙে নানা রূপে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হয় প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের কালো হাত। আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর দাঁড়প্রান্তেও নব্য বিভেদপন্থীদের উন্মেষ ঘটেছে। তারা আজ নানাভাবে নানা কায়দায় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংস করার জঘন্য পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ একাধারে তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের সস্তা শ্লোগান দিয়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের ন্যায় অধিকারের কথা বলে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে যাচ্ছে, পাশাপাশি বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বেধে একটি সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহল সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অপব্যবহার করে চুক্তি বাস্তবায়নের ধোঁয়া তুলে প্রকারান্তরে চুক্তি বাস্তবায়নে চরম বিরোধিতা করে চলেছে। বাহ্যতঃ তাদের চলমান ধারা দুই বিপরীত মেরু হলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ দুই বিপরীত মেরু থেকে চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাই আসুন একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিই সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, তাদের সকল প্রকার হীনতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র সমূলে ধ্বংস করি।

আগের যে কোন সময়ের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা অধিকতর পরিমাণে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভূমি অধিকারসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের অপতৎপরতা তারা ক্রমবর্ধমান হারে চালিয়ে যাচ্ছে। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর ঘৃন্য ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের সকল শাসকগোষ্ঠী লালন ও ধারণ করে চলেছে। বাহ্যতঃ অবয়ব ভিন্ন হলেও তাদের মৌলিক রূপ ও মুখোশ একই ও অভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে যখন এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণের অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা ভিত্তি রচিত হতে চলেছে তখন তারা আরও অধিকতর নগ্নভাবে রাষ্ট্রশক্তির ছত্রছায়ায় সর্বশক্তি নিয়ে তা বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আসুন আমরা অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে সেসব সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অপশক্তির বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিই। দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে এম এন লারমার লালিত স্বপ্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিই। আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে শাসক-শোষকগোষ্ঠীর সকল অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র গুড়িয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম হিমাদ্রী উদয়ন চাকমা	১-১৬
২.	প্রতিফলন তাতিন্দ্রলাল চাকমা	১৭-১৯
৩.	অগ্রন্থিত অহংকারে সদানন্দ চাকমা	১৯
৪.	জুমের দেশে তাঁকে ফিরে পেতে হবে আবার সঞ্জীব দ্রং	২০-২২
৫.	শ্রদ্ধাঞ্জলী পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা	২২
৬.	জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এম এন লারমার অবদান শক্তিপদ ত্রিপুরা	২৩-২৫
৭.	নভেম্বর চেতনা তনয় দেওয়ান	২৫
৮.	মহান শহীদের শেষ বিদায় জগদীশ চাকমা	২৬-২৭
৬.	শহীদ মানবেন্দ্র নাবায়ণ লারমা : জীবন ও সংগ্রাম সালাম আজাদ	২৮-৩০
৭.	১০ নভেম্বর একটি সংগ্রামী স্মৃতি বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	৩১-৩২
৮.	বাঁশী কেন আর বাজে না ? অমিয় প্রসাদ চাকমা	৩৩-৩৪
৯.	প্রয়াত এম.এন. লারমা স্মরণে স্তুতি গীতি বিজয় গিরি গেংগুলী	৩৪
১০.	১০ নভেম্বর ও আজকের প্রত্যাশা ধীর কুমার চাকমা	৩৫-৩৭

১১.	শোক না চেতনা তনয় দেওয়ান	৩৮-৪১
১২.	গৃহযুদ্ধ পূণ্য বিকাশ চাকমা কীটো	৪২-৪৪
১৩.	তুমি চিংহ্রামং মারমা (তপু)	৪৪
১৪.	যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ চাকমা	৪৫-৪৬
১৫.	এম এন লারমার প্রতি খোলা চিঠি সুদৃষ্টি	৪৭-৪৯
১৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা মঙ্গল কুমার চাকমা	৫০-৬৮
১৭.	চুক্তি বিরোধীদের প্রতি খোলা চিঠি জীবন চাকমা	৬৯-৭৫
১৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে মৃগাংক খীসা	৭৬-৭৯
১৯.	পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও 'জনদরদী' প্রসঙ্গে মঙ্গল কুমার চাকমা	৮০-৮২

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম

হিমাদ্রী উদয়ন চাকমা

রাঙামাটি শহরের অনতিদূরে মহাপুরম একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়েই ছোট নদী মহাপুরম প্রবাহিত। কিন্তু আজ সেই কর্মব্যস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহাপুরম কাপ্তাই হ্রদের অথৈই জলে বিলীন হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি ও গৌরব। এই মহাপুরম গ্রামেই জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত, মহান দেশপ্রেমিক, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের ঘনিষ্ট বিপ্লবী বন্ধু, কঠোর সংগ্রামী, ক্ষমাশীল, চিন্তাবিদ, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু) ১৯৩৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা সেই গ্রামেরই জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, ধার্মিক ও সমাজসেবী। স্নেহময়ী মাতা সুভাষিনী দেওয়ানও একজন ধর্ম্মপ্রাণা সমাজ হিতৈষীনি ছিলেন। এম এন লারমারা তিন ভাই ও এক বোন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে জন্মস্থানের বাস্তুভিটা জলমগ্ন হলে পানছড়িতে নব বসতিস্থাপন করেন। এম এন লারমা মাতা-পিতার তৃতীয় সন্তান। তাঁর একমাত্র বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু) সবার বড়। তিনিও বেশ শিক্ষিত। বড় ভাই শুভেন্দু প্রবাস লারমা (বুলু) ১০ই নভেম্বর মর্মান্তিক ঘটনায় শহীদ হন। শহীদ শুভেন্দু লারমা রাজনৈতিক জীবনে একজন সক্রিয় সংগঠক, বিপ্লবী ও একনিষ্ঠ সমাজসেবক ছিলেন। ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। তিনি পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি হচ্ছেন একজন বিপ্লবী নেতা, সংগঠক, সমাজসেবক, নিপীড়িত জাতি ও জুম্ম জনগণের একনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু, মহান দেশপ্রেমিক ও কঠোর সংগ্রামী। তিনি জনসংহতি সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শান্তিবাহিনী গঠনে তাঁর অবদান ও ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ সালের মর্মান্তিক ঘটনায় এম এন লারমা শহীদ হওয়ার পর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। এম এন লারমা যৌবনকালে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বিপ্লবী জীবনে কঠোর পরিশ্রমের ফলে পরবর্তীকালে তাঁর স্বাস্থ্য কিছুটা ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর কথাবার্তা মৃদু, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, আচার ব্যবহার অমায়িক, ভদ্র ও নম্র। তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান ও সুশৃঙ্খল ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সাদাসিদাভাবে জীবন যাপন করতেন। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি সৃজনশীল মেধার অধিকারী ছিলেন। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। অসীম ধৈর্য, সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও কষ্ট সহিষ্ণুতার অধিকারী ছিলেন। এসমস্ত গুণাবলী অর্জনে তিনি তাঁর পিতা-মাতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

এবার কর্মময় জীবনের পরিচয়ে আসা যাক। ১৯৬৬ সালে তিনি দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামে এক প্রাইভেট বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর সুদক্ষ কর্মকৌশলের ফলে ঐ বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি ছিল খুবই আর্কষণীয়। অতি সহজে তিনি কঠিনতম বিষয়বস্তু সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারতেন। শিক্ষকতার জীবনে তিনি ছাত্র সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেতেন। তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ে আইএ ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে আইএ পাশ করেন। আইএ পাশ করার পর একই কলেজে বিএ ক্লাশে ভর্তি হন। তখন অধ্যায়নরত অবস্থায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে পাকিস্তান সরকার তাঁকে নিরাপত্তা আইনের অধীনে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে গ্রেপ্তার করেন এবং প্রায় দুই বৎসরের অধিক কারাবরণ করার পর শর্তসাপেক্ষে ৮ই মার্চ ১৯৬৫ সালে মুক্তি পান। সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে থেকে একই বৎসরে বিএ পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে বিএড পাশ করেন ও ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশ করে একজন আইনজীবি হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে চারু বিকাশ চাকমা বাংলাদেশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হলে ঐ মামলার আইনজীবি হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা ও মহানুভবতার পরিচয় দেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল হতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীসহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তারপরে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ গণ পরিষদে সদস্য থাকার সময়ে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৪ সালে লন্ডনে যান।

এবার আসা যাক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয়ে। শ্রদ্ধেয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনটাই হচ্ছে আগাগোড়া রাজনৈতিক মহান কর্মকান্ডে বিজড়িত। তিনি পরিবারের পরিবেশ থেকেই রাজনীতির হাতেখড়ি নেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অধিকার হারা জুম্ম জনগণের মর্মবেদনা অনুভব করতে পেরেছিলেন। প্রজা শ্রেনী যখন অভিজাত শ্রেণীর নিপীড়ন নির্যাতনে ও শোষণের আষ্টেপৃষ্টে বাধা ছিল, তখন নেতার পিতামহ এইসব নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সেই

যুগে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন প্রগতিবাদী হিসেবে সামন্ত শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজীবন একজন সংগ্রামী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সর্বোপরি তাঁর জেঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা যিনি মহান শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী হিসাবে সর্বপ্রথম জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো দিয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে ব্রতী ছিলেন। সেই মহান ব্যক্তি থেকেও তিনি রাজনীতির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই স্বীয় সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় একদিন জনৈক শিক্ষক মহোদয় ইসলামিক ইতিহাসের উপর পাঠদানের সময় জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসের সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট কথা বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে শিক্ষক মহোদয়ের উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং শেষ পর্যন্ত মাননীয় শিক্ষক তা সংশোধন করে নিতে বাধ্য হন। এইভাবে তিনি ছাত্র জীবন থেকে স্বকীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগ্রামমুখর ছিলেন।

১৯৫৬ সালেই তিনি সর্বপ্রথম জুম্ম ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৭ সালের পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলনে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি তখন থেকেই সকল অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে থাকেন। নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমে তার পূর্ণ স্বাক্ষর মিলে। তিনি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের মাননীয় সুপার ছাত্রাবাসের পরীক্ষার্থীদেরকে সুবিধামতভাবে আহারের সময় নির্ধারণ করে দিতে অনুমতি প্রদান না করলে পরীক্ষার্থীরা তাঁরই নেতৃত্বে অনশন ধর্মঘট করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদানে বাধ্য হন।

কলেজ জীবনে তিনি রাজনীতির বৃহত্তর চত্বরে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি আগের চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। ১৯৬০ সাল জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে এক কালো মেঘ। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণে উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে পাহাড়ী ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। ১৯৬২ সালে ঐতিহাসিক পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন তাঁরই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করার পর তিনি গ্রামে ফিরে আসলেন এবং একদিকে জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন আর অপরদিকে পাহাড়ী ছাত্র সমাজকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকেন। অপরদিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনেও পদচারণা করতে থাকেন। আর স্বজাতিকে কীভাবে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করা যায় তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। এইভাবে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণভাবে জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করার কার্যে নিয়োজিত থাকেন।

প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত সমাজ যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজকে অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্টে ধরে সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছিলো না, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি যখন আপন জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্য হারাতে বসলো; উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার যখন জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটার পর একটা হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো; ঠিক সেই সময়ে রাজনীতির অঙ্গনে পাকাপোক্তভাবে ১৯৭০ সালে আবির্ভূত হলেন এম এন লারমা বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারা মানবতাবাদ নিয়ে লুপ্ত প্রায় জুম্ম জাতির রক্ষাকবচ হিসাবে। বিলুপ্ত প্রায় জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দিল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেখতে পেল ঘুমন্ত শিশুর চোখে আধুনিক জগতের সভ্যতার আলোক দিশা। চিনতে লাগলো নিজ জাতীয় সত্তাকে । খুঁজতে লাগলো আপন জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করার মুক্তির পথ। ঠিক এমনি সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধে এম এন লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সুকৌশলে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দুরে সরিয়ে রাখে।

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ করলো কিন্তু জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তিত হলো না। শুরু হলো উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদের নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন। মুক্তিবাহিনী ও সরকারী বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত হলো অক্ষম ও দুর্বল জনগণ। বহু ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই করে দিল; শত শত মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করে দিল; রাইফেলের গুলিতে হত্যা করলো শত শত লোককে। কত অশ্রু ঝরলো চোখে, কত রক্ত ঝরলো বুকে। হায়রে, হতভাগ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম। এইভাবে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, হত্যা, ডাকাতি, লুঠতরাজ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল তখন জুম্ম জাতি রক্ষা করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে আসলেন শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও সচেতন জুম্ম সমাজ। দেশ, সমাজ ও দেশ রক্ষার ডাক দিলেন প্রিয় নেতা এম এন লারমা। ১৯৭২ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হলো 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র ও প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। জনসংহতি সমিতির

পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি। সমিতির কাজ এগিয়ে চললো দুর্বার গতিতে। তার গতি অপ্রতিরোধ্য। সে চললো রাইফেলের বেয়নটের মাথায়; সে চললো মেশিন গানের গুলির মুখে। কোন কিছু রোধ করতে পারলো না সমিতির মহান কর্মকান্ড। ১৯৭৩ সাল। শুরু হলো নিয়মতান্ত্রিক লড়াই। ৭ই মার্চ নির্বাচন হলো। বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করলো এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল থেকে। দক্ষিনাঞ্চল থেকে জয়লাভ করলো চাইথোয়াই রোয়াজা। বিজয় উল্লাসে নেচে উঠলো জুম্ম জনগণ। খুশীতে আত্মহারা জনগণের মুখে ধ্বনিত হলো--

এম এন লারমা জিন্দাবাদ
চাইথোয়াই রোয়াজা জিন্দাবাদ
জনসংহতি সমিতি জিন্দাবাদ

এই শ্লোগানে মুখরিত হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী পুরুষ শিশু আবাল বৃদ্ধ বনিতা মনে করলো তাদের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার প্রস্তুত হলো। সুদৃঢ় ও সুগম হলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রামের পথ। বাংলাদেশের গণ পরিষদের অধিবেশন বসলো। অধিবেশনে যোগদান করার জন্য গেলেন জনগণের দুই প্রতিনিধি শুধু প্রতিনিধি নয় তাঁরা গেলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে। শুরু হলো অধিবেশন যথা নিয়মে। এই অধিবেশনে জুম্ম জনগণের একমাত্র আশা ভরসার গণ প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের বাঁচার দাবী উত্থাপন করলেন। তিনি দাবী জানালেন - জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। তিনি আবেগময়ী ও অনলবর্ষী ভাষায় তুলে ধরলেন - বৃটিশ ও পাকিস্তান সরকারের আমলের নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের কথা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা জাতিসত্তার কথাও দাবী করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের জন্য ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে সুতরাং জুম্ম জনগণের শোষণ ও বঞ্চনার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, যে বাঙ্গালীরা অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই বাঙ্গালীর শাসকেরাই আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ শুধু ওখানেই ক্ষান্ত হয়নি। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মুখোশ পড়ে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের এক কলমের খোঁচাতেই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করলো - বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙালী নামে পরিচিত হবে।

আজীবন সংগ্রামী গণ প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংবিধানের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানালেন। তিনি সংযত ও দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন - 'একজন বাঙালী কোনদিন চাকমা হতে পারে না অনুরূপ একজন চাকমাও কোনদিন বাঙালী হতে পারে না'- এই বলে তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ সংসদ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। তারপর অধিবেশন শেষ করে তিনি তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসলেন। এদিকে তাঁর সহকর্মীরা অধিবেশনের ফলাফল শুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ফিরে এসে রাগে ও ক্ষোভে বললেন - 'না, এভাবে আর হবে না।' অন্য পথ ধরতে হবে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের হীন কার্যকলাপের চিত্র তুলে ধরলেন। এরপর অনেক আলাপ আলোচনা হলো। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে পুনরায় ডেপুটেশন দেয়া হবে স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমানের নিকট। এই ডেপুটেশনেও তিনি নেতৃত্ব দিলেন। যথাসময়ে ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক বসলো। এখানেও দাবী করা হলো জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা ও অধিকার। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যুত্তরে এম এন লারমাসহ ডেপুটেশনের সকল সদস্য হতবাক ও স্তম্ভিত না হয়ে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বললেন - 'লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬ লাখ। বেশী বাড়াবাড়ী করো না। চুপচাপ করে থাক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো না (হাতের তুড়ি মেরে মেরে তিনি বলতে লাগলেন) প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১০ লাখ বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ করে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো।'

এইভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো। বাংলাদেশ সরকারের কাছ হতে যখন আর কোন কিছু আশা করতে পারা গেল না তখন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পাশাপাশি অনিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের কথাও এম এন লারমা ভাবলেন অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯৭৩ সালে গড়ে উঠলো পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে 'শান্তিবাহিনী'। পাশাপাশি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গড়ে উঠলো গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি ও মিলিশিয়া বাহিনী। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সাল এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী বাকশালী সরকারের পতন হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অভ্যুত্থানের পর পরই আত্মগোপন করেন এবং তখন থেকেই সরাসরি আন্দোলনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলেন।

১৯৭৭ সালে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। জাতীয় সম্মেলন চললো বেশ কয়েকদিন ধরে। পার্টির কার্য সুষ্ঠু ও

শক্তিশালী করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় এম এন লারমাকে পার্টির সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হলো। শুরু হলো আবার শত্রু সরকারের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ আরো ঐক্যবদ্ধ হলো। পার্টি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। অপরদিকে সামরিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এম এন লারমার শক্ত পরিচালনায় ও শিক্ষায় শান্তিবাহিনী ক্রমান্বয়ে এক শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল মুক্তিবাহিনীতে গড়ে উঠলো। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, মনোবল ও সামরিক দক্ষতা দেখে শত্রুবাহিনীর মনে ত্রাসের সঞ্চার হলো। দেশে-বিদেশে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের কথা, শান্তিবাহিনীর বীরত্বের কথাও প্রচার হতে লাগলো। যুগে যুগে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আন্দোলনে কখনো হয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামী; আবার কখনো হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী। আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনেও প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী চিন্তাধারার লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে পার্টিতে কাজ করে আসছিল। তারা কখনো সেজেছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিক, কখনো সেজেছিল বিপ্লবী, কখনো সেজেছিল বাস্তববাদী প্রগতিশীল ব্যক্তি আবার কখনো হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে অভিনব রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু এম এন লারমা অতি দক্ষতার সহিত সুকৌশলে এসবের মোকাবিলা করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। একদিকে জাতীয় শত্রু বাংলাদেশ সরকার অন্যদিকে গৃহশত্রু সুবিধাবাদী গোষ্ঠী - এই দুই শত্রুর সঙ্গে ক্রমাগত জনসংহতি সমিতি মোকাবিলা করে আসছে।

১৯৮২ সাল জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ দিন। এই বছরে এতদিনে লুকিয়ে থাকা সেই প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ও ক্ষমতার লোভে উচ্চাভিলাষী হয়ে, সর্বোপরি দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক গুপ্তচর, দালাল ও ফক্কড়দের চক্রান্তে জড়িত হয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে দেয়। ১৯৮২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জাতীয় সম্মেলন শুরু হলো। এই উপদলীয় চকান্তকারীরা পার্টির নীতি ও কৌশল তথা নেতা ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপস্থাপন করে থাকে এবং সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। এই চক্রান্তকারীরা দ্রুত নিষ্পত্তির মতো অবাস্তব ও সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত করে রাতারাতি দেশ উদ্ধারের নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব '৮২ সালের জাতীয় সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনেও তৃতীয়বারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্টির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা সম্মেলনের রায় মেনে নিলেও চক্রান্তের নাটক এখানে শেষ হলো না। সম্মেলনের পর এরা আবার নুতন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো অতি সঙ্গোপনে, গোপন বৈঠকে তারা পার্টির সমান্তরাল আর একটি পার্টি সৃষ্টি করে সেখানে একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা করলো। কমিটির নাম দিলো জাতীয় গণ পরিষদ। এইভাবে উপদলীয় কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে লাগলো। তার বহিঃপ্রকাশ হলো ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি। চক্রান্তকারীরা কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ যখন সরিয়ে ফেলতে থাকে তখন ১৪ই জুন কেন্দ্রীয় অনুগত বাহিনীর সাথে চক্রান্তকারীদের উস্কানীতে এক সংঘর্ষ বাঁধে। এভাবে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে।

পার্টির সভাপতি এই সময়ে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির সাথে মোকবিলা করে যেতে থাকেন। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য, সাহস, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতায় এই গৃহযুদ্ধ অবসান করানোর পথ উন্মুক্ত হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ, প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী দ্রুত নিষ্পত্তিবাদীরা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াসে পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করলো। গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্টির সভাপতি বিভেদপন্থী উপদলীয় চক্রান্তকারীদেরকে পুনরায় বৈঠকে বসার জন্য আহ্বান জানালেন এবং বিভেদপন্থীদের সবাইকে ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এই ক্ষমা ঘোষণায় তিনি তাঁর মহানুভবতার ও ক্ষমাশীলতার এক নজীর স্থাপন করে জাতীয় ইতিহাসে মহান নেতার পরিচয়ে আরেক বার স্বাক্ষর রাখলেন। যথারীতি উভয় পক্ষের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির মহান স্বার্থে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা নীতি'র ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু জুম্ম জাতীয় কুলাঙ্গার, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা জাতীয় স্বার্থের সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক গুপ্তচর ও দালালদের উস্কানীতে উচ্চ পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের কালি শুকোতে না শুকোতেই ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে গৃহযুদ্ধ এক মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। এইভাবে জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবনাবসান হলো।

যিনি জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন করেছিলেন, যিনি জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের মহান পার্টি - জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়েছে যার পতাকাতলে দশটি ভিন্ন

ভাষাভাষি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, যাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় জুম্ম জাতি ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েও আজ টিকে আছে, সেই মহান চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত পার্টি, শান্তিবাহিনী তথা জুম্ম জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বের যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। জুম্ম জাতির কর্ণধার, মহান দেশপ্রেমিক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অবদান জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম তথা বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে চিরস্মরণীয় ও চির দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। তাঁর প্রদর্শিত পথ ও নির্দেশিত নীতি-কৌশল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে একমাত্র দিশারী হয়ে থাকবে। মহান নেতার আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিটি মুক্তিকামীর এক জ্বলন্ত অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।

এম এন লারমার চিন্তা-চেতনায় একদিকে যেমনি নিখাদ জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম বিকশিত হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের নিপীড়িত ও শোষিত জাতি ও সর্বহারা মানুষের প্রতি প্রেম, মমতা ও দায়িত্ববোধ গভীরভাবে গ্রোথিত হয়েছিল। স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেম, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি মমতা, দায়িত্ব সম্পাদনে সততা, কর্তব্য পালনে অসীম সাহস ও দৃঢ়তা, শোষণ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, সহযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা, দুস্থ ও আর্তমানবতার প্রতি দয়া ও ভালবাসা সর্বোপরি নীতি-আদর্শে অটল আত্মবিশ্বাস তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল। অথচ শাসক-শোষকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা মহান নেতা এম এন লারমাকে গোয়েবলীয় ষ্টাইলে গোড়া থেকেই বারবার এই ব্যর্থ অপপ্রচার চালিয়ে আসছে যে - তিনি ছিলেন একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু ইহাই আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে - শাসক-শোষকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের উপরোক্ত বক্তব্য নিছক অপবাদ ও অপপ্রচার ছাড়া বৈ কিছু ছিল না। এম এন লারমা তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করে গেছেন যে - তিনি শুধু জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের তথা বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, অধিকার হারা জাতি ও সর্বহারা মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু ও বলিষ্ঠ নেতা। তাই তিনি কেবল বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য আজীবন আন্দোলন করেননি, বস্তুতঃ বাংলাদেশের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি বিশ্বের পরাধীন মুক্তিকামী জাতি ও সর্বহারা মানুষের অধিকারের পক্ষেও সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। বস্তুত এদেশের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাসে এম এন লারমার নাম ও অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তিনি উপনিবেশিক ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের অভিশপ্ত জোঁয়াল থেকে জুম্ম জাতিকে রক্ষা করাসহ বাংলাদেশের আপামর জনগণের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত পঙ্গু দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার মহান সংগ্রামে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত গণ পরিষদ এবং তৎপরবর্তী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এম এন লারমার প্রদত্ত ভাষণসমূহ পর্যালোচনা করলেই তাঁর সুদূরপ্রসারী বিপ্লবী জীবন ও চিন্তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসন থেকে স্বতন্ত্রভাবে মোকাবেলা করে এম এন লারমা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন এবং পরবর্তী ১৯৭৩ সালে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন। ইহা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে যদিও এম এন লারমার সংসদীয় জীবন মাত্র অর্ধ যুগের তা সত্ত্বেও এই সংক্ষিপ্ত সংসদীয় জীবনে তিনি সাংসদ হিসেবে যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বাগ্মীতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, দেশপ্রেম, আইনের শাসন, সততা, নির্ভীকতা ও রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম কাজ ছিল একটি আদর্শ সংবিধান রচনা করা - যে সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণীগত নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। আর এই মহান কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তালো সত্তর সালের নির্বাচনে নির্বাচিত তৎকালীন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত গণ পরিষদের উপর। তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হলো। জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের আপামর জনগণের বুকভরা আশা ছিল সংবিধানে জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং উপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমন-পীড়নের চির অবসান হবে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী ইতিহাস থেকে সেই শিক্ষা নিতে পারেনি। পারেনি উত্তাল গণ

আন্দোলনের যুগে প্রতিশ্রুত মহান ঘোষণার কথা স্মরণে রাখতে।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণ পরিষদে বিল আকারে উপস্থাপিত হলো। দেখা গেল খসড়া সংবিধানে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, মাঝিমাল্লা, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, চির নির্যাতিতা নারী প্রভৃতি খেটে খাওয়া ভাগ্যবিড়ম্বিত সর্বহারা জনগোষ্ঠীর অধিকার সংবিধানে লেখা হয়নি। সর্বোপরি যুগ যুগ ধরে পৃথক শাসনে শাসিত এবং চির লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারও সংবিধানে কণামাত্র ঠাঁই দেয়া হয়নি। উপরন্তু স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী জুম্ম জনগণকে বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত করার সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে প্রণীত হলো যদিও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল। অতএব মহান নেতা ও তৎকালীন গণ পরিষদে একমাত্র নির্দলীয় সদস্য এম এন লারমা তাঁর ঐতিহাসিক সংগ্রামী দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। পৃথক শাসনের অধিকারী জুম্ম জাতিসহ নিষিদ্ধ পল্লীতে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিতা মহিলা ও বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তিনি গণ পরিষদে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ৭২ সালের ২৫শে অক্টোবর গণ পরিষদের অধিবেশনে বলেন--

"মাননীয় স্পিকার সাহেব আমাদের দেশের জন্য যে সংবিধান আমরা রচনা করতে যাচ্ছি, আপনার মাধ্যমে আজকে এই মহান গণ পরিষদে দাঁড়িয়ে সে সংবিধানের উপর আমি কিছু আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যারা কারাগারে তিল তিল করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল, যারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসককে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসি মুখে হাতকড়া পরেছিলেন, হাসি মুখে ফাঁসি কাষ্ঠকে বরণ করেছিলেন, তাদেরকে। ১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এ দেশ থেকে চলে যাবার পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্য যে কৃত্রিম স্বাধীনতা হয়েছিল, সে কৃত্রিম স্বাধীনতার পর থেকে যেসব বীর, যেসব দেশপ্রেমিক নিজের জীবন তিলে তিলে চার দেয়ালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীকার আদায়ের জন্য, যারা নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে স্বাধীকার আদায়ের পথে গিয়েছিলেন তাদের কথা আজকে আমি স্মরণ করছি, তাদের প্রতি আজকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে এখানে যারা সমবেত হয়েছেন, যে মাননীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ রয়েছেন, তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তারপর, আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গত এপ্রিল মাসে যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল, সে কমিটির সদস্য বন্ধুদের। সর্বশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জননেতা, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকে আমরা এই গণ পরিষদ ভবনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণ করছি। এই ইতিহাসের পেছনে রয়েছে কত করুণ কাহিনী, কত মানুষের অশ্রুর ধারায় কান্নার কাহিনী, বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ। তাই আজকে আমরা সেসব মানুষের কথা স্মরণ করে যদি বিবেকের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যায়, তাহলে এই কথায় আমরা বলবো, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যে পবিত্র শপথ আমরা নিয়েছি, সে পবিত্র শপথ নিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য যে পবিত্র দলিল আমরা দিতে যাচ্ছি, সে পবিত্র দলিলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কিনা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা অর্থাৎ তারা যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়, সে কথা এই সংবিধানে ব্যক্ত হয়েছে কিনা। তাই মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে যে কথা তুলতে যাচ্ছি, তাতে যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে, তাহলে আমি তা শুধরে নিতে চাই কিন্তু আমি মনে করি, আমি আমার বিবেক থেকে এসব কথা বলছি। আমি কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কিছু বলতে যাচ্ছি না। যেহেতু আমি একজন নির্দলীয় সদস্য, যেহেতু আমি এই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষেরই একজন হয়ে আজকে গণ পরিষদ ভবনে আমার মতামত প্রকাশ করতে যাচ্ছি, সাড়ে সাত কোটি মানুষের নিকট প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তাই সংবিধানের উপর আমার কোন চুলছেরা ব্যাখ্যা নেই। আমার যে ব্যাখ্যা, আমার যে মত, আমার যে বক্তব্য, তার সবই দেশের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যেভাবে আমার দেশকে ভালোবেসেছি, আমার জন্মভূমিকে ভালোবেসেছি, যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আমার দেশকে, আমার জন্মভূমিকে, এদেশের কোটি কোটি মানুষকে দেখেছি, সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি খসড়া সংবিধানকে দেখতে যাচ্ছি।.....

তাই আমি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য বন্ধুদের বলছি যে, খসড়া সংবিধান তারা গত জুন মাসে দিতে পারেনি যদিও গত জুন মাসের ১০ তারিখে দেওয়ার কথা ছিল। আজকে এই অক্টোবর মাসে আমাদের এই খসড়া সংবিধান তারা দিয়েছেন। এই খসড়া সংবিধান আমরা জুন মাসে পায়নি, সেজন্য দুঃখিত নই। অক্টোবর আর জুন মাসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েকটি মাসের। সেজন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত,

আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এখানে আমার আপত্তি হচ্ছে এই যে, যে কমিটিকে আমরা এদেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ভার দিয়েছিলাম, সে কমিটি প্রদত্ত সংবিধান আজকে আমাদের হুবহু গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই পরিষদের সামনে আমার বক্তব্য হলো, আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই এই গণ পরিষদে এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে সে আপত্তি হল, আমার বিবেক আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না।

কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আজকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আপনারা বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের কথা সমাজতন্ত্রের নামে, গণতন্ত্রের নামে বলে চলেছেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার সে রকম নাই। তবু আমার বিবেক বলছে এই সংবিধানের কোথায় যেন গলদ রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যারা কল-কারখানায় চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাঁদের রক্ত ছুষে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ প্রতিটি জিনিস তৈরী হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের মনের কথা এখানে নাই। তারপর আমি বলবো, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ, তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।.....আজ পল্লীর আনাচে-কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা-বোনকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। এই সংবিধানে সেই মা-বোনদের জীবনের কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি। যদি এটা আদর্শ সংবিধান হতো, যদি এটা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হতো, তাহলে আজকে যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে নিজেদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে, তাদের কথা লেখা হত, তাদেরকে এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করে আনার কথা থাকত, কিন্তু তাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের কথা, ছেয়ে পরে বেঁচে থাকার কথা এই সংবিধানে নাই।

এই সংবিধানের মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে অতীতের ইতিহাস স্মরণ করে আমি বলবো যে, ইতিহাস কাউকে কোনদিন ক্ষমা করেনি, করবেও না, ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। আমরা দেখেছি ১৯৫৬ সালের সংবিধান যে সংবিধানকে আইয়ুব খানের মত একজন সৈনিক লাঠি মেরে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাকিস্তানের বুকে স্বৈরাচারী সরকার গঠন করেছিল। তারপর ১৯৬২ সালে তার মনের মত একটি সংবিধান রচনা করে সেটাকে দেশের বুকে চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছিল যে তার এ সংবিধান এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে। কিন্তু এদেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেনি। এই সংবিধানও যদি সে ধরণের হয়ে যায়, তাহলে ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে? তাই ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মত, ১৯৬২ সালের সংবিধানের মত এই সংবিধানকেও কি আমরা হতে দিব, আমার বিবেক বলছে, আমরা এমন সংবিধান চাই না। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সে রকম সংবিধানই আমরা চাই। আমার যে মনের কথা তা আমি ব্যক্ত করলাম।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যে পবিত্র দলিল আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, সেটা যেন ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের দলিলের মত না হয় এবং সে দিনের মত করুণ অবস্থা যেন আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না হয়। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আমরা সে সন্দেহের অবসান না করি, পরিষদে আমরা যদি তার নিরসন না করি, তাহলে আর কে করবে? আমাদের পর যারা আসবেন, তাদের সেই একই করুণ অবস্থা হবে যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের জন্য। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক, আমরা তা চাই না। .....সংবিধানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনের কথা যদি সত্যিকারভাবে লিপিবদ্ধ হত, তাহলে আজকে নির্দলীয় সদস্য হিসেবে এই সংবিধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পারতাম। অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে না পারার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ হল, এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার, এই দলিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এক হাতে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্য হাতে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদ এবং ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে--

১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এবং

২০। কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী - এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য প্রত্যেকে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

মাননীয় স্পীকার, আজকে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমুহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের ধারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতা বলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি টাকার মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন। মাননীয় স্পীকার, তাই এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা প্রাণের কথা এখানে প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথার প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবী এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন তাদের কথা সংবিধানে নাই। তারা যদি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে যাচ্ছ - তোমরা তাতে আমাদের কথা কি কিছুই লিখেছ' এই প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দেব? যে মেথররা দেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, আজ আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তাদেরকে কি আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছি? তাদের অভিশপ্ত জীবনকে সুখী করে তোলার মত কতটুকু আমরা দিয়েছি, এই সংবিধানে আমরা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি? কিছুই না।

আমাকে আজ বলতে হচ্ছে, বাংলাদেশে যারা সত্যিকারের শোষিত, নিপীড়িত তাদের কথা এই সংবিধানে নাই। হাঁ, তাদের কথা এই সংবিধানের আছে, যারা শোষিত নয়, নির্যাতিত নয়, নিপীড়িত নয়। মাননীয় স্পীকার, তাই আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না হয়, তাহলে আমরা দেশকে কেমন করে গড়ে তুলব, দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যতে সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করবো? এরপর, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই। আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি সে কথা আমি না বলে পারছিনা। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এ সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল, অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কিভাবে ভুলে গেলেন আমাদের দেশের কথা - পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এ এলাকার সেই সব ইতিহাসের কথা, আইনের কথা এই সংবিধানে কোথাও কিছু নাই।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে একজন সরল মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমাদের এলাকাটা একটা উপজাতি এলাকা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, মুরুং এবং চাক এই রূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষের কথা আমি বলতে চাই। এই উপজাতি মানুষদের কথা বৃটিশ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিল। পাকিস্তানের মত স্বৈরাচারী গভর্ণমেন্ট আমদের অধিকার ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করে নিয়েছিল। জানি না, আজকে যেখানে গণতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সমাজতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সেখানে কেন আপনারা আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন? পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নেও উপজাতিদের অধিকার আছে। পৃথিবী আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত - আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র - আমরা সেখানে দেখি, তাদের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। জানি না, আমরা কি অপরাধ করেছি? আমি যতদূর বুঝতে পারি, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কি জ্বালা, তা আমি বুঝাতে পারব না। সেই জ্বালা আর কারোর ভিতর নাই। সেই জ্বালার কথা কেউ চিন্তা করেননি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, ১৯৪৭ সালে কেউ কি চিন্তা করেছিলেন যে, পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে? জনাব মোঃ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, 'Pakistan has come to stay'। নিয়তি অদৃষ্ট থেকে সেদিন নিশ্চয় উপহাস ভরে হেসেছিলেন। সেই পাকিস্তান অধিকার হারা বঞ্চিত মানুষের বুকের জ্বালায়, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আমি আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমি একজন নির্যাতিত অধিকার হারা মানুষ। পাকিস্তানের সময় দীর্ঘ ২৪ বছর পর্যন্ত একটি কথা আমরা বলতে পারিনি। আমাদের অধিকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া

হয়েছিল। সেই অধিকার আমরা পেতে চাই এবং এই চাওয়া অন্যায় নয়। সেই অধিকার এই সংবিধানের মাধ্যমে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মত যাতে সেই অধিকার আমরাও পেতে পারি, সেই কথাই আজকে আপনার মাধ্যমে পরিষদের নিকট নিবেদন করতে চাচ্ছি। সেই অধিকারের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের হয়নি, যেমন দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষকে। তাই আমি আমার কথা যদি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য-সদস্যাদের, ভাই-বোনদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমি মনে করব, আমার অভিব্যক্তি স্বার্থক হয়েছে। কারণ, আমার যে দাবী সেই দাবী আজকের নয়। এই দাবী করেছি স্বৈরাচারী আইয়ুব ও স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার সময়ও।

আমরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে রয়েছি। অগ্রসর জাতির মত শক্তিশালী দল গঠন করে দাবী আদায় করতে পারছি না। কারণ এতে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতার দরকার, ততটা রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে উপজাতিদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে তাই কথা প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বদৌলতেই আজকে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জলবিদ্যুতের বদৌলতে কল-কারখানা চলছে। অথচ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে যারা দেশকে গড়েছে, পাকিস্তানে শাসকরা তাদের মানুষের মত বাঁচার অধিকার দেয়নি। আমার বক্তব্য হল, আজকে আমরা এই সংবিধানে কিছুই পায়নি। আমি আমার বক্তব্য হয়তো সঠিকভাবে বলতে পারছি না, কিন্তু আমার বক্তব্যের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই নাই। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আমাদের জাতির পিতা শুদ্ধেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেছিলাম, আমাদের উপজাতিদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের কথা বলেছিলাম। এই সংবিধান আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা বঞ্চিত মানব। আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

এই সংবিধানের বাইরের কথা আমি বলতে চাচ্ছি না। আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা সংবিধানে বলা হয়নি। এইজন্য এই কথা বলছি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা ইতিহাস। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি জানি না, আমাদের কথা তাঁরা কেমন করে ভুলে গেলেন? আমরাও যে বাংলাদেশের সঙ্গে এক হয়ে গণ বাংলার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে চাই, সেই কথা তারা কি ভুলে গেছেন? আমাদের এই সংবিধানের খসড়া তৈরী করার সময় তারা অন্যান্য দেশের সংবিধান দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের এক কোণায় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কিসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি? আমরা জানি ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না। কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? কেন আমরা অভিশপ্ত জীবন যাপন করবো? পাকিস্তানের সময়ে ছিল আমাদের অভিশপ্ত জীবন। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হতে চলেছে। আমাদের অধিকার তুলে ধরতে হবে এই সংবিধানে। কিন্তু তুলে ধরা হয়নি। যদি আমাদের কথা ভুলে যেতে চান, যদি ইতিহাসের কথা ভুলে যেতে চান, তাহলে আপনারা পারেন। কিন্তু আমি পারি না। উপজাতিরা কি চায়? তারা চায় স্বাধীন গণ পরিষদের অধিবেশনে তাদের সত্যিকারের অধিকারের নিশ্চয়তা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। সেই বঞ্চিত মানুষের একজন হয়ে আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নির্যাতিত সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে, সেই পাকিস্তান আমলের যে নির্যাতন ভোগ করেছি সেই নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে চাই। আমরা চাই মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে। এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। তাই আজকে আমি বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে কি অপরাধ করেছে, তা আমি জানি না। পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত জাতিকে, অনগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।

.....পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে। আমি একজন মানুষ যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছি, যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত পালিত হয়েছি, সেই জন্মভূমির জন্য আমার যে কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না পারি, যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে পাই না, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে। তাই আমার কথা শেষ করার আগে আমার কথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে

চাই, এই সংবিধানে মানুষের মনের কথা লেখা হয়নি।''

গণ পরিষদে খসড়া সংবিধানকে দফাওয়ারী বিবেচনা কালে ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২ইং আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো - ''৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'' আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেদিন ঐ সংশোধনী প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। এই সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে বাঙালী জাতি থেকে সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে বাঙালী জাতিতে রূপান্তরিত করার হীন ষড়যন্ত্রের সাংবিধানিক রূপ লাভ করে। এম এন লারমা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ অনির্দিষ্ট কালের জন্য গণ পরিষদের অধিবেশন বর্জন করলেন। সেদিন তিনি উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এভাবে-

''মাননীয় স্পীকার সাহেব, জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলে পরিচিত হবেন। মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান বিলে আছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।' এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙালী বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে আমরা লেখা পড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরাও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরাও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়ে আমরা এক সঙ্গে এক যোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ - কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালী।

আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালী বলে পরিচিত করতে চায়। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদেরকে বাঙালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদের বাঙালী মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালী বলে নয়। .....মাননীয় স্পিকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হল। আমি এই প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য গণ পরিষদ বৈঠক বর্জন করছি।''

প্রসঙ্গতঃ ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধান বিল বিবেচনা কালে এম এন লারমা চৌদ্দটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তন্মধ্যে ৪৭ক অনুচ্ছেদ নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বায়ত্বশাসনের ধারা সংযোজনী প্রস্তাব ব্যতিত অবশিষ্ট সব ক'টি প্রস্তাব বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার ও সমগ্র দেশের সার্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ছিল। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগের নব্য শাসকগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ গণ পরিষদে তার কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। গোটা সংবিধানটি ৬৫ টি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে গৃহীত হলেও তন্মধ্যে বিরোধীদলের (ন্যাশানেল আওয়ামী পার্টি) একমাত্র সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের একটি সংশোধনী ব্যতিত অবশিষ্ট ৬৪ টি সংশোধনী ক্ষমতাসীন দলের। কাজেই এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৎসময়ে গৃহীত সংবিধান দেশের সামগ্রিক স্বার্থের চাইতে আওয়ামী নব্য শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থই সেখানে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজা যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের সংসদীয় আসনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এম এন লারমা সংসদের ভিতরে ও বাইরে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র এই চারটি মূলনীতি স্বীকৃত হয়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হলেও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ও জাতীয় সংসদের অধিবেশনে অপরাপর ধর্মকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হতে থাকে। জাতীয় সংসদের অধিবেশনের শুরুতে কেবল কোরআন তেলওয়াত ও গীতাপাঠ করা হয়ে থাকে। অতএব, এম এন লারমা এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। তিনি ৭ই এপ্রিল ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তুলে ধরলেন যে--

"মাননীয় স্পীকার, শপথ গ্রহণের আগে আমাদের দিনের কর্মসূচী যখন আরম্ভ হয়েছে তখন পবিত্র কোরআন থেকে সুরা পাঠ এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়েছে। এখন আপনার মাধ্যমে এই পরিষদের নিকট আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই পরিষদে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রতিনিধিত্ব করছি। বাংলাদেশের শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক নাই - বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকও আছেন। মাননীয় স্পীকার এখন আমার প্রশ্ন হল যে, কেবল পবিত্র কোরআন পাঠ এবং গীতা পাঠ করা হবে, না বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল থেকেও পাঠের প্রয়োজন আছে?"

এম এন লারমার দাবীর প্রেক্ষিতে যদিও বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হবে বলে সেদিন আইনমন্ত্রী পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্তী আরও বেশ কয়েকবার এ বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে তবেই ত্রিপিটক পাঠ ও বাইবেল পাঠ করা হয়। এভাবে জাতীয় সংসদে এম এন লারমার প্রথম বিজয় সূচিত হলো এবং খ্রীষ্টান ধর্মীয় মহল থেকে এম এন লারমাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং খাদ্যশস্যর মধ্যে ধান হলো প্রধান ফসল। কাজেই কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং দেশের খাদ্য সংস্থানের ক্ষেত্রে ধান চাষের উন্নতি ও উচ্চ ফলনশীল ধানের গবেষণা অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার জাতীয় সংসদে ৯ই জুন ১৯৭৩ইং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিল, ১৯৭৩ উত্থাপন করেন। ঐ বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিধি বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিলটিকে ১৭ই জুন, ১৯৭৩ তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হোক - এই শিরোনামে এম এন লরামা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন -

"....এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল। বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক দেশ। আমাদের এই দেশ সম্পূর্ণভাবে ধান চাউলের উপর নির্ভরশীল। যে দেশ ধান চাউল না হলে অন্য সব কিছুর উন্নয়ন ঠিকমত চালিয়ে যেতে পারে না, সে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দেখতে হবে কিভাবে ধান চাষ করা যায়। সেইজন্য এই ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট করা হবে - যা শুধু একদিনের জন্য নয় যতদিন দেশ থাকবে, ততদিন এই ইনষ্টিটিউট থাকবে। সুতরাং বিলটাকে যদি আমরা ভালভাবে যাচাই না করি, তাহলে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে কুখ্যাত মোনায়েম সরকার যেভাবে Grow more food campaign করে অফিস থেকে শুধু বস্তা বস্তা কাগজের হিসাব পাঠাত, কিন্তু সরেজমিনে কোন কাজ হত না, সেই অবস্থার আশংকা থাকতে পারে। সুতরাং এটা শুধু আজকে বিরোধীতার খাতিরে নয় বা কার্যপ্রনালী বিধি বিলের ক্ষমতা পেয়ে যে বিলটি প্রচার করাতে যাচ্ছি তা নয়। এটা সম্বন্ধে জনগণের মতামত আমাদের শুনে নেওয়া উচিত। তাই আমি 'জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি প্রচার হোক।'- এই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করলাম।"

এম এন লারমার উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রণীত পরিকল্পনা ও আইন বিধি কেবল সুরম্য অট্টালিকার চার দেওয়ালের মধ্যে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন পন্ডিতী পর্যালোচনার মাধ্যমে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে আলোচনা পর্যালোচনার পর সকল স্তরের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত আইন বিধি প্রণয়নে সবিশেষ প্রাধান্য দিতেন। এই পদ্ধতি বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে দেশে দেশে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এম এন লারমার ঐ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সেদিন ধ্বনি ভোটে নাকচ হয়ে যায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার তার প্রতিশ্রুত গণমুখী নীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করে। গণমুখী নীতি থেকে সরে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবি জনগণের স্বার্থের চাইতে দেশের আমলা শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীর তোষণনীতি প্রকাশ পেতে থাকে। দেশের রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প কারখানা, বীমা শিল্প, রেলওয়ে তথা দেশের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে নিজেদের সুবিধামতো সাজাতে থাকে। 'বীমা কর্পোরেশন বিল, ১৯৭৩' নামে সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে সরকার বীমা শিল্পকে তথাকথিত ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এম এন লারমা এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই যুক্তিতে বিলটি জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব রাখেন যে--

"রাষ্ট্রায়ত্ব বীমা কোম্পানীগুলোর সম্পদ এ দেশের অর্থনীতির সাথে যুক্ত। সরকার এসব বীমা কোম্পানী উন্নতি করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছেন সে নীতি যেন জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হতে পারে, জনগণ বুঝতে পারে সেইজন্য বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য পাঠাতে অনুরোধ করছি।"

বলা বাহুল্য এম এন লারমার উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। রেলওয়ে বোর্ডের অবকাঠামো এবং রেলওয়ের বাজেটের উপরও তিনি ২১শে জুন, ১৯৭৩ ইং সংসদে সরকারকে সমালোচনা করেন এবং লক্ষ লক্ষ নিম্ন শ্রেণীর অবহেলিত কর্মচারীর স্বপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন।উক্ত ভাষণে তিনি বলেন -

"আজকে সেই রেলওয়ে বোর্ডের কর্মচারীদের আরাম-আয়াসের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে ৩১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। অথচ এই বাবদে ১৯৭২-৭৩ সালে বরাদ্ধ ছিল ২৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এদের জন্য আরও কিছু বেশী সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ রেলওয়ে যেসব নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে, যেমন লাইনম্যান, সিগনালম্যান, এদের কল্যাণের জন্য কিছুই করা হয়নি। সুতরাং আমাদের এ ব্যাপারে

একটা পরিকল্পনা করা উচিৎ। আজকে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য আমরা কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তা ভঙ্গ করতে পারব না। আমরা দেশকে বিপদে ফেলতে পারব না। আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব উন্নতির দিকে। এখানে দেখা যায় একজন পয়েন্টস্‌ম্যান, একজন ট্রেনের টিকেট কালেক্টরের বেতন, আর রেলওয়ে বোর্ডের কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এর উপর আরও ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি। সেগুলো হচ্ছে (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ)।

জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমদের এটা সম্পূর্ণরূপে চিন্তা করা উচিৎ, যাঁরা পাকিস্তান আমলে, বৃটিশ আমলে সব সময় সুখে শান্তিতে আরাম-আয়েসের সাথে জীবন যাপন করে এসেছিল, যাঁদের ১০-১২ কামরার বাড়ী দেওয়া হয়েছিল তাঁরা সেখানে সব সময় আরাম-আয়েস করছেন এবং এখনও করছেন। আর সেই পয়েন্টস্‌ম্যান দিন রাত কাজ করে তাঁরা বৃষ্টিতে ভিজে, কড়া রৌদ্রে পুড়ে কাজ করেন অথচ তাঁদের জন্য থাকার বন্দোবস্ত নেই। আজকে সরকারী বিনিয়োগের প্রতিদান খাতে বাজেটে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। এ আয় কারা করবে? এই সব নিম্ন বেতনের কর্মচারীরা এ টাকা আয় করে দিচ্ছে। আজকে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের কর্মচারীরা পরিশ্রম করছেন নিচের দিকের কর্মচারীরাই প্রকৃত পক্ষে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কাজেই আমি যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি, সেটা আমি এখানে ব্যাখ্যা করলাম।''

১৯৭৩-৭৪ বাজেটসহ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপরও আলোচনা করতে গিয়ে এম এন লারমা ২৩শে জুন ১৯৭৩ইং বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটকে এলিট শ্রেনীর বাজেট বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি উক্ত আলোচনায় বলেন -

''....মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাজেটে অর্থমন্ত্রী কোন লুকোচুরি করেন নাই। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, খাদ্য ঘাটতি সব কিছুই খুলে বলেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে বিদেশ থেকে খাদ্য না আনলে খাদ্য-ঘাটতি পূরণ হবে না। মাননীয় স্পীকার সাহেব, যে কথাটা আমদের মনে বাজে, সে কথাটা হলো আমাদের অভাব অপরিসীম, আমাদের সমস্যা অসংখ্য। হাজারো সমস্যার মোকাবেলা করেই আমরা দেশকে গড়ে তুলবো। সংবিধানের মাধ্যমে যে সুখী জীবন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, সে প্রতিশ্রুতি বাজেটে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়। বাজেটে একটা বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। সেখানে গলদ রয়েছে। সে গলদটা হলো যে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে বাজেটে পুরোপুরি দূর্বলতা রয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই দূর্বলতার কথাটা বলার সাথে সাথে একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। সে ছবিটা হলো যখন কেনাকাটা করার জন্য কোন দোকানে আমরা যাই, দোকান থেকে বের হওয়ার সময় দেখা যায় কয়েকজন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোক এসে বলছে, ''স্যার, দু'টো পয়সা''। আজ এই বাস্তব জীবনের ছবি নিয়ে যেখানে হাজার হাজার কোটি-কোটি টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে, সেখানে এ সমস্ত লোকের আশা-আকাঙ্খা পূরণের কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং যে ভিখারী, সেও মানুষ, আর আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি, আমিও মানুষ। কিন্তু দুই মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই দু'য়ের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবার পরিকল্পনা এই বাজেটে স্থান লাভ করেনি। সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই এই বাজেট শ্রেষ্ঠ সমাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল্যায়ণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বাস্তবায়নের কথা এই বাজেটের বক্তৃতায় পরিস্কারভাবে বলেননি। ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বাজেটে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের প্রথম পদক্ষেপ পূরণে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন - এটা তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন। সুতরাং এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে সামাজিক পরিকল্পনা, আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য সার্বিক জীবনের আদর্শের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দিতে হবে। সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বৎসর প্রথম বাজেটে সে প্রতিশ্রুতি যা সংবিধানে দেওয়া হয়েছিল - মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার পাবে - আজকের বাজেটে তা কি উল্লেখ করা হয়েছে? বিশেষ করে কৃষি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক যে সমস্ত বিষয় আছে, তার সম্বন্ধে কতটা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আর এ সমস্ত বিষয়ের সাথে জমি ও সম্পদ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সম্পদ বন্টন যদি সত্যিকারভাবে না হয়, তাহলে সবকিছুই ব্যর্থ হবে। তাই এই বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে হিসাব শিক্ষাখাতে, স্বাস্থ্য খাতে, প্রতিরক্ষা খাতে, জনকল্যাণ খাতে বা শিল্প খাতে দেখানো হয়েছে, যে অর্থ সমস্ত খাতে বরাদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে জড়িত সম্পদ বন্টনের সাথে। সে সম্পদ বন্টন কি ধরণের হবে তার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হবে সে আইনের কিছুই আজ আমরা জানি না। সেই আইন যদি সম্পূর্ণ না হয়, তবে মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।

সংবিধানে তিন প্রকার মালিকানার ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। এগুলো পরিস্কারভাবে কি ধরণের হবে, এখনো সে জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এই বাজেট পেশ করার আগে দেশের রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানা কি ধরণের হবে, তা একটা পরিস্কার আইনের মাধ্যমে প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া

উচিত ছিল। যেমন জমির মালিকানা একশত বিঘা করা হয়েছে, তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানা কত হাজার বা কত লক্ষ টাকা হবে, সমবায়ী মালিকানা কত লক্ষ বা কত কোটি টাকা হবে সেগুলো ঠিক করার উপরই সংবিধানে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নির্ভরশীল। .....তাই যে প্রতিশ্রুতি আমরা মানুষকে দিয়েছি, তা বাস্তবায়িত করতে হবে, দেশের সমস্যার সমাধানও করতে হবে। দেশের শোষণ-ভিত্তিক অর্থনীতিকে ভেঙ্গে আস্তে আস্তে করে সম্পদের অধিকার জনগণকে দিতে হবে। এটা অবশ্য একদিনে সম্ভব নয়। বৎসরে সম্ভব নয়, এর জন্য দীর্ঘদিনের সময়ের প্রয়োজন হবে। তাই এ ভুল যাতে আমরা প্রথম থেকেই না করে বসি, সেই প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা এই বাজেটে দেওয়া উচিত ছিল।....''

একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সংসদে এম এন লারমা সংগ্রাম করে গেছেন। এটা তাঁর বাংলাদেশের সার্বোভৌমত্বের প্রতি অগাধ আস্থা ও আনুগত্যতারই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। ১৯৭৩-৭৪ বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উক্ত অভিব্যক্তিরই প্রতিফলন ঘটান। উক্ত আলোচনায় তিনি বলেন-

''.....মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের শতকরা ১৬ ভাগ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্ধ করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকা যেমন প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে দেশরক্ষাও তেমনি প্রয়োজন। সরকার জোট-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন, আমরা কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সাময়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হব না; সব রাষ্ট্রই আমাদের বন্ধু। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় আত্মরক্ষার। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাই দেশ রক্ষার জন্য আমদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ডিফেন্স বাজেট করা হয়েছে ৪৭ কোটি মাত্র - জল, আকাশ এবং স্থলবাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্র-এ সুসজ্জিত করতে হবে। তুলনামূলকভাবে দেখা যায় রক্ষীবাহিনীর জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে ১৫ কোটি ৮২ হাজার টাকা। তারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে। জল, আকাশ এবং স্থল - এই তিনটি হিসাবে দেখা যায় এক একটির জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। আমার মনে হয় প্রত্যেক বাহিনীর জন্য এর তিনগুণ অর্থাৎ ৪৮ কোটি টাকা করে বরাদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। যারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, সিভিল গভর্ণমেন্টকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে তাদের রণসম্ভার বেশী থাকবে। যারা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করবে, তাদের থাকতে হবে আর্মস এন্ড এ্যামুনেশন এবং এজন্য সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে। ডিফেন্স-এর জন্য পাকিস্তান আমলে বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করা হতো। আমি এতটা অনুরোধ করছি না। আমার মনে হয়, শতকরা ১৬ ভাগ থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ ৩০ ভাগ ডিফেন্স বাজেট-এ বরাদ্ধ করা উচিৎ ছিল। এতে ক্ষতি হতো না।.....''

বাংলাদেশের কারাগারসমূহের অব্যবস্থা, সুস্থ সামাজিক পরিবেশের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও চরম দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই এম এন লারমা কারাগারের আমূল সংস্কারের কথা সংসদে তুলে ধরেন। কয়েদীদের দুঃসহ জীবনের মর্মান্তিক দৃশ্য তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কারাভোগের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বাজেটের উপর আলোচনা কালে কারাগার সংস্কার সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তা হলো --

''মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাজেট বক্তৃতার কোথাও কারাগারের আমূল সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারা জীবন সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নাই। কারাগারে কয়েদীরা কিভাবে বন্দী জীবন যাপন করছে, যারা কারাগারে গিয়েছেন, তারাই তা পরিস্কারভাবে জানেন। বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা সেখানে কিভাবে জীবনযাপন করছেন। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী সেটা জীবন নয়। আইয়ুব খান আমাকে ২ বৎসর জেলে রেখেছিলেন এবং ১ বৎসর গৃহে অন্তরীণ রেখেছিলেন। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে ২ বৎসর জেলে ছিলাম। নিরাপত্তা আইনে বন্দী হয়ে আমি জেলে যাই এবং আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসেবে রাখা হয়। 'একখানা থালা আর ২ খানা কম্বল - এই হল জেলখানার সম্বল' জেলখানার সবাই এই ছড়া বলত। যেখানে জীবন বলতে কিছুই নাই। সেখানকার কষ্টের কথা আর কত বলব। প্রথম প্রথম আমি প্রস্রাব পায়খনায় যেতে পারতাম না। একটা ড্রামের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা; তাও আবার পর্দা নাই। জেলখানার সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন আজও হয় নাই। একটা লম্বা শেডে যে রকম অবস্থার মধ্যে মানুষকে রাখা হয় সেখানে কোন মানুষ থাকতে পারে, সে কথা কেউ চিন্তা করতে পারবেন না।

একজন যদি রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে বা অন্য কোন ফৌজদারী অপরাধে বন্দী হয়ে জেলে থাকে, তাহলে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আসার সুব্যবস্থা রেখে দেওয়া উচিত। জেলে যেসব ক্রিমিন্যাল আসামী থাকে, তাদের জন্যও এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে তারা জেল থেকে ফিরে এসে সৎ জীবন যাপন করতে পারবে। একজন আসামী যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে জেলে থেকে ১২ বৎসর পরে যখন সে বাইরে আসে, তখন সে তার সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখে না। একেবারে বৃদ্ধ বয়সে ফিরে এসে তার বাঁচবার কোন অবলম্বন থাকে না। একজন অপরাধ করে জেলে গেলে জেল থেকে তাকে ঠিকভাবে পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা সরকার করেন না। জেলে থাকাকালে তার অপরাধ প্রবণতা থেকে তাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করা হয় না। মাননীয় জজ সাহেব, বিচার করে একজন খুনীকে জেলে পাঠালেন বা চোরকে জেলে

পাঠালেন। সে কারাগারে গেল। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হলো না। এ পর্যন্ত কতজনের প্রাণদন্ড হলো, কতজনের সশ্রম কারাদন্ড হলো, কিন্তু তবুও কি অপরাধের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হলো? তাই দেখতে হবে সমস্যা কোথায়। মানুষ যদি খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সে অপরাধ করেনা।.....''

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সংসদে নিত্য নতুন বিল উত্থাপনের মাধ্যমে অনেক আইন কানুন প্রণয়নে বাহ্যতঃ সচেষ্ট হয়। কিন্তু এ সব আইন-কানুন নতুন আঙ্গিকে উত্থাপন করা হলেও বস্তুতঃ এসব আইন কানুন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের ধারা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। 'ফার্মেসী (সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪' উত্থাপনের মাধ্যমে ফার্মেসী আইনে নতুন ধারা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে ঔপনিবেশিক আমলের মৌলিক সনাতনী ধারা বলবৎ রেখে কেবলমাত্র রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদের পরিবর্তে দশ বছরের মেয়াদ প্রদানের সংশোধনী সংযোজন করা হয়। এটা মূলতঃ শাসকগোষ্ঠীরই অংশ বিশেষ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রণীত হয়। জনগণের স্বার্থ এখানে উপেক্ষিত থেকে যায়। তৎপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত ফার্মেসী বিলের উপর ২০ শে নভেম্বর, ১৯৭৪ ইং সংসদে আলোচনা করতে গিয়ে এম এন লারমা বলেন --

''ফার্মেসী বিলে পাঁচ বছরের বদলে দশ বছরের সংশোধনী আনা হয়েছে। সার্বিকভাবে ফার্মেসী এ্যাক্টের আওতাভুক্ত যেসব হাজার হাজার ফার্মেসী রয়েছে সেদিকে তাকালে আমাদের কাছে বর্তমানের দূরাবস্থা পরিষ্কারভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ....সুতরাং আজকে ঔষুধ তৈরীর ব্যাপারে যাদের মূল্যবান সাজেশন দ্বারা ফার্মেসীগুলি পরিচালিত হয়, তারা যদি সেইসব ফার্মেসীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে শুধু পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর করা কোন যৌক্তিকতা থাকে না। যৌক্তিকতা থাকত যদি এই ফার্মেসী এ্যাক্টকে সংশোধন করে ফার্মেসীগুলিকে ভালভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হত।.....

মাননীয় স্পীকার, আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে এটা আশা করি না। কারণ আমরা সবাই ভুক্তভোগী । এই ফার্মেসীগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা না করে শুধু তাদের রেজিষ্ট্রেশন দেবার ব্যাপারে পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর করা উচিৎ নয়। তাছাড়া দেখা উচিত, জনসাধারণ ঠিকমত ঔষধ পায় কিনা, ঔষধ-বিক্রেতা ঠিকভাবে ঔষধ বিক্রি করে কিনা, ঔষধ তৈরী ঠিকমত হচ্ছে কিনা এবং ঔষধে ভেজাল আছে কিনা ইত্যাদি। সেই ব্যবস্থা না করে এইভাবে ছোট ছোট সংশোধনী এনে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। সুতরাং এ ধরণের সংশোধনী না করে যাতে জনসাধারণের মঙ্গল হয়, দেশের উন্নতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিলটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আনা উচিত। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমি এই আবেদন জানাচ্ছি যে, এ ধরণের আইন না এনে, ফার্মেসী এ্যাক্ট করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেশের মানুষের প্রতি নজর দেওয়া দরকার।''

বলাবাহুল্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদৌলতে এম এন লারমার এই মূল্যবান প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। সাংসদ এম এন লারমা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার বাক-স্বাধীনতার জন্য সংসদে আগাগোড়া সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলাদেশের সরকার গোড়া থেকেই নানা বিধি-নিষেধ সম্বলিত কালো-কানুনের মাধ্যমে জনগণের বাক-স্বাধীনতা রুদ্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। 'মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিষ্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪' প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের বাক-স্বাধীনতার উপর চরম আঘাত হানতে সচেষ্ট হয় সরকার। উক্ত বিলের উপর ২০ শে নভেম্বর, ১৯৭৪ইং সংসদে এম এন লারমা বলেন --

''.....বাংলাদেশের সংসদ গঠিত হবার পর এমনি করে গতানুগতিকভাবে তাই একটার পর একটা বিল উত্থাপিত হচ্ছে এবং সেই বিল আইনের আকারে দেশের মানুষের উপর প্রয়োগের জন্য সংসদে গ্রহণ করা হচ্ছে। আজকেও ঠিক তদ্রুপ একইভাবে এই বিল আনা হয়েছে আমাদের সামনে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমনই একটা ভয়াবহ আইন সংসদের সামনে উত্থাপিত করেছেন। এই আইনের ফলে মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের মুখের ভাষা খুলে বলার উপায় থাকবে না। এর ফলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হবে। এই মৌলিক অধিকারের জন্য যুগের পর যুগ আবহমান কাল থেকে মানুষ সংগ্রাম করেছে। যে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ সংগ্রাম করেছে, আজ সেই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য সংসদে এই ভয়াবহ ও মারাত্মক বিল উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ভয়াবহ ও মারাত্মক আইন দ্বারা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই বিল আনয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি মানুষের চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। ৩৯ অনুচ্ছেদে আছে -

(১) চিন্তা বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জন-শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটন, প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে - (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, যদি বাধা নিষেধ সাপেক্ষে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তবে সেই বাধা

নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের এমন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, জন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি ও অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে নিশ্চয়তা দানের কী অসুবিধা দেখা দিয়েছে, যার জন্য আজ এ ধরণের আইন আনা হয়েছে? চিন্তা বিবেক ও বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা সম্পূর্ণরূপে হরণ করে আইনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে পালনের জন্য কী প্রয়োজনে এই আইন সরকার সংসদে উত্থাপিত করেছেন? .....এই আইন করে তারা কি দেশে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করে আজকে সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেশের কাজ না করে আওয়ামী লীগ সরকার যে কাজ করে চলেছে ভাবতে অবাক লাগে।

একের পর এক কালাকানুন ও গণ-বিরোধী আইন করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাক-স্বাধীনতাকে হরণ করে, বাংলাদেশের মানুষের এগিয়ে চলার পথ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিয়ে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ বর্ণিত 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও বাক্ স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না' - এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করেছে। আজকে আমাদের দূর্ভাগ্য। অধিকার আদায়ের জন্য মানুষ তার জীবনকে উৎসর্গ করে। এই উৎসর্গের ফলস্বরূপ আজকের এই স্বাধীন বাংলা। এই স্বাধীন বাংলাকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গড়ে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম। সেই দায়িত্ব পালনে সংবাদপত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ সংবাদপত্রে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা প্রতিফলিত হয়। এই বাক্ স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহলে আজকে মানুষ তার মনের কথা কীভাবে জানবে? কীভাবে জানবে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, কোথায় কোথায় অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় কোথায় গলদ দেখা দিয়েছে? সেজন্য তার বাক্ স্বাধীনতা যদি না থাকে, সরকারকে এগুলি দেখিয়ে দেবে কিভাবে? সরকারের ব্যর্থতা যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে সরকার কিভাবে তার ভুল সংশোধন করবে?

.....আজকে বাংলাদেশের দুর্নাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। টোকিওতে ইন্টারন্যাশন্যাল প্রেস ইনষ্টিটিউট-এ যে কনফারেন্স হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের সংবাদপত্র সম্পর্কে এমন একটা রূঢ় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই। আজকে তদ্রুপ এমন একটি আইনে শুধু সংবাদপত্রের নাম করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অধিকারকে খর্ব করা হল। এর জবাব সরকারের নিকট চাই। .....আজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য মানুষের কণ্ঠ রোধ করার জন্য বিল আনা হচ্ছে। চিয়াং-কাইশেক, সিংম্যান রীর মতো অটোক্রেটরা মানুষের বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাননি। আইয়ুব খানের সরকার, ইয়াহিয়া খানের সরকার এই স্বাধীনতা দিতে চাননি। সেই আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান আজকে কোথায় ভেসে গেলেন। আজ আমরা কেন ঐ সব আইনের পুনরাবৃত্তি করতে যাব? সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষের মনের কথা প্রকাশিত হয়। মনের ভাব প্রকাশের এই পথ যদি সম্পূর্ণরূপে রোধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এখানে গণতন্ত্র আর থাকবে না। গণতন্ত্র যদি না থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্র কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সংবিধানের এই উক্তি - 'মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে' কোনদিনই বাস্তবায়িত হবে না।.....

মাননীয় স্পীকার স্যার, সংবাদপত্রের অধিকার খর্ব করার পেছনে সরকারের কি যুক্তি আছে, জানি না। কিন্তু একটা কথা সব সময় আমাদের মনে থাকবে যে, এই সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পর একের পর এক অনেক পত্রিকার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছেন। যেমন, 'লাল পতাকা', 'গণশক্তি', 'মুখপত্র', 'দি স্পোকসম্যান'। এমনিভাবে বিভিন্ন পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। তদুপরি, সাম্প্রতিককালে 'দৈনিক গণকণ্ঠের' আল মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়েছে, যার কথা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশকে টিটকারী করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে জাতিসংঘের সাথে জড়িত দি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি মন্তব্য করেছে - *'Poet Al-Mahmood is the prisoner of conscience.'*

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিল সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি সব কথা বলব না। সরকারকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে অধিকারের প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছেন, যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সেই সংগ্রামের কথা ভুলে যাবেন না। সেই সংগ্রামের কথা যদি ভুলে যান, তাহলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস আইয়ুব খানকে, ইয়াহিয়া খানকে যে পথে নিয়ে গেছে, আপনাদেরকেও সেই একই পথে নিয়ে যাবে।''

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কালাকানুনের অন্যতম জঘন্য আইন হলো - বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ সন। ১৯৭৪ সনে বিশেষ ক্ষমতা বিল সংসদে উপস্থাপিত হলে অনায়াসে পাশ হয়ে যায়। ফলতঃ আপামর সংগ্রামী জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে রুদ্ধ করার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠে। ২১ নভেম্বর, ১৯৭৪ইং ''বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪'' বিবেচনাকালে এম এন লারমা এর সুদুরপ্রসারী জঘন্য রূপ তুলে ধরেন এভাবে -:

''মাননীয় স্পীকার, স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এর আওতাভূক্ত আসামীদের কঠোর সাজা দেওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল করা হয়েছে এবং সেই স্পেশাল ট্রাইবুনাল এর আসামীদের দোষে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃক যে মাল-মসলা পাওয়া যায়, সেটা আসামীর পক্ষেই হোক অথবা বাদীর পক্ষেই হোক অথবা স্পেশাল ট্রাইবুনালের পক্ষেই হোক - সেটাকে অগ্রাহ্য করে নতুন করে পুনর্বিবেচনার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনালকে ক্ষমতা দিয়ে আজকের এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এটা স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, যেটাকে অত্যন্ত শক্ত আইন হিসেবে তৈরী করা হয়েছিল। এটা সম্বন্ধে সরকার পক্ষের ভাষায় ছিল যে, যারা দুর্নীতি পরায়ণ, যারা দেশের শত্রু, যারা দেশের ভিত্তিকে নষ্ট করে দিতে চায়, তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য হল এই কঠোর আইন। অথচ আজকে আবার পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে সেটাকে শিথিল করে দেওয়ার জন্য যে সংশোধনী আইন আনা হয়েছে, এটাকে একটা প্রহসন ছাড়া কিছু বলা যায় না। এটা বিরোধী দলগুলোর কণ্ঠরোধ করার জন্যই শুধু আনা হয়েছে। ....

আমরা এটাকে কালোতম আইন বলেছিলাম। আমাদের সেই কালোতম আইন কথাটি ঠিকই ছিল। যারা চোরাকারবারী, যারা দেশের শত্রু, তাদেরকে এইভাবে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশোধনীটি যদিও ছোট, কিন্তু এর বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ। তাই এই মহান সংসদের মাননীয় সদস্য এবং সদস্যাগণ এটাকে গ্রহণ করবেন কিনা, এটা গ্রহণ করা উচিত কিনা, এই বিবেচনার ভার রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।''

বস্তুতঃ তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও একনায়কসুলভ কর্তৃত্বপনা ধীরে ধীরে চরম আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে বিরুদ্ধবাদী সকল সংগ্রামী জনতার উপর তখন সরকার নির্বিচারে ধরপাকড় ও দমন-পীড়ন শুরু করে দেয়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা মুক্ত গণতন্ত্র চর্চার সকল ক্ষেত্র রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বাকশাল নামক একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামোকে করায়ত্ব করা হতে থাকে। বিরোধী দলের সদস্যদের বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের বঞ্চিত অবহেলিত ও নির্যাতিত জনগণের একনিষ্ঠ বন্ধু ও আপোষহীন সংগ্রামী এম এন লারমাকে পাকিস্তানপন্থী, বিরুদ্ধবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি মনগড়া অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর উপর দমন-পীড়ন শুরু হতে থাকে। জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের উপর দমন-পীড়নের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। অবশেষে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। মহান নেতা এম এন লারমার গোটা আত্মনিবেদিত সংসদীয় জীবন ছিল সংগ্রামে ভরপুর। বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি সংসদে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান চিন্তা ভাবনা অকপটে প্রকাশ করে গেছেন এবং তাঁর চিন্তা ও আদর্শের সপক্ষে তথা বাংলাদেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকারের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। সংসদে তাঁর এই সংগ্রাম ও সাহসিকতা বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের মাঝে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলাদেশের আপামর জনগণের মাঝে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন 'লারমা' নামের একজন অকুতোভয় সংগ্রামী হিসেবে। বস্তুতঃ তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী সমৃদ্ধশালী আত্মনির্ভরশীল একটি স্বাধীন বাংলাদেশের - যেখানে থাকবে না কোন প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণীগত শোষণ, নিপীড়ন, হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি। যেখানে থাকবে জাতিতে জাতিতে ভালবাসা ও পরস্পর অধিকারের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীলতা।

তিনি কখনোই উগ্র জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ ভাবাদর্শে তাড়িত হননি। তিনি জুম্ম জনগণের জন্য কখনো দাবী করেননি বাংলাদেশ থেকে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত স্বশাসনের মাধ্যমে তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার অকৃত্রিম আকাংখা পোষণ করতেন তিনি। তাঁর সংগ্রামকে তিনি কখনোই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিপরীতে পরিচালিত করেননি। পক্ষান্তরে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে মজবুত করতে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রয়াসী। ষাট দশকে স্বৈরাচারী পাকিস্তান বিরোধী গণ আন্দোলনসহ স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর সংসদীয় জীবনের টানা অর্ধ যুগের অধিক দিন পর্যন্ত তিনি জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মাঝিমাল্লা, তাঁতী, কামার, কুমার, কর্মচারী, নির্যাতিতা মহিলা প্রভৃতি আপামর জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য এবং সর্বোপরি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলার জন্য আপোষহীন সংগ্রামে নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন। তাই মহান নেতা এম এন লারমা কেবল জুম্ম জনগণের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও সংগ্রামী নেতা নন, তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবি সংখ্যালঘু তথা নির্যাতিত নিপীড়িত অধিকারহারা জনগণের এক বলিষ্ট নেতা - যার চিন্তা-চেতনা, সংগ্রামী প্রত্যয় ও দৃঢ়তা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত ও অধিকারকামী মুক্তি পাগল জনগণের চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

প্রতিফলন

তাতিন্দ্র লাল চাকমা

জাতীয় চেতনার অগ্রদূত এম এন লারমা একটা কথা বার বার বলতেন - জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁর এই বক্তব্যের মর্মার্থ তখনকার সময়ে কিছু সংখ্যক সচেতন লোকের মধ্যে উপলব্ধি হলেও সমগ্র জুম্ম জাতির মধ্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করা সহজ ছিল না।

বৃটিশ শাসনের মধ্যে এই জুম্ম জাতি পার্বত্য অঞ্চলে আর যাই হোক এক ধরণের নিশ্চয়তার মধ্যে ছিল কিন্তু পাকিস্তানের শাসনামল থেকে এই ষড়যন্ত্র যে শুরু হয়েছিল তা সচেতন ব্যক্তি হিসেবে কতিপয় জুম্ম বুদ্ধিজীবিরা টের পেলেও সমগ্র জনগণের মধ্যে তার উপলব্ধি হয়নি। সত্তর দশকে এসে যখন রাজনৈতিক ডামাঢোলে একের পর এক নগ্ন হামলা জুম্ম জনগণের উপর চলতে থাকে তখন থেকে জাতিগত নির্যাতন নিপীড়ন সম্পর্কে সহজ সরল মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সত্তর দশকে যখন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সমগ্র জুম্মদেরকে 'বাঙ্গালী' হয়ে যাবার পরামর্শ দেন তখন থেকেই এই উপলব্ধিই বাড়তে থাকে যে জুম্মদের আলাদা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। তখনই এম এন লারমা কিছু সংখ্যক সহযোগী পান এবং তদানীন্তন সরকারের কাছে সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করেন। বাস্তবক্ষেত্রে এম এন লারমার বক্তব্যের বাস্তবতা মানুষ কিছুটা উপলব্ধি করলেও কি উপায়ে জুম্ম জনগণ এই ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাবে তার পদ্ধতিগত সমস্যার সমাধান করা বাকী ছিল।

এম এন লারমা আরো বলেছেন - এই ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেতে গেলে জুম্ম জনগণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যের প্রতিফলন কিছুটা দেখা যায় বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেখানে জুম্ম জনগণ অকল্পনীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এম এন লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজাকে নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু নির্বাচনই শেষ কথা নয়। খোদ বাংলাদেশের মধ্যেও তখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। তাই জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলেও সরকার কর্তৃক এম এন লারমা তথা জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক দাবীকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। যার পরিণতিতে এম এন লারমাকে বিকল্প পথে অগ্রসর হতে হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছেড়ে অনিয়মতান্ত্রিক পথে পা বাড়াতে বাধ্য করা হয়।

নিয়মতান্ত্রিক থেকে অনিয়মতান্ত্রিক এই দুই পদ্ধতির মধ্যে জুম্ম জনগণ তাদের ঐক্য শক্তি কিন্তু সমানভাবে বজায় রাখতে পারেনি। আন্দোলনের গতিপথ যতই দূর্গম ও রক্তাক্ত হতে থাকে ততই সমাজের একটা অংশকে দেখা গেছে সংগ্রামের পথ থেকে পলায়ন করছে এবং ক্রমেই তারা ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। তখনই উপলব্ধি হয়ে গেছে ইস্পাত কঠিন ঐক্য কেন প্রয়োজন জুম্ম জনগণের জন্য। একদিকে জুম্ম সমাজের একটা অংশ মরিয়া সংগ্রামে নিয়োজিত আর একটা অংশ দালাল রাজনীতিতে ব্যতিব্যস্ত। এই রকম বিপরীতমুখী অবস্থার এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনগনের পক্ষে জনসংহতি সমিতি ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজীতে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

একদিকে রণক্লান্তি অন্যদিকে সীমাহীন সমস্যা জুম্ম জনগণের মধ্যে। এভাবে ২০০০ সালের আগমন। চুক্তির প্রধান পক্ষ হিসেবে সরকারের এই চুক্তি বাস্তবায়নের সদিচ্ছা আছে কি নেই তা দেখতে দেখতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াতেই সরকারের অসদিচ্ছাও আরেকবার প্রমাণিত হলো। বহিরাগতদের সবাইকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণকে নিজেদের এলাকায় নিজেদের জন্মভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র পুনরায় হলো। অথচ চুক্তির 'ক' (সাধারণ) খণ্ডের ১ নম্বরে লেখা হয়েছে - উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু নূতন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে দেখা যাবে তিন পার্বত্য জেলারই বহিরাগতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী এক দশকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব নামমাত্র হয়ে পড়বে। এর পরিণতি হচ্ছে জুম্ম জনগণ আর নিজস্ব প্রতিনিধি জাতীয় সংসদে প্রেরণ করতে পারবে না। এমনকি স্থানীয় নির্বাচনগুলোতেও নিজেদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে পারবে না। তার অর্থ জুম্ম জনগণকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আগের সরকারগুলোর অনুসৃত নীতি এ সরকারও পরিত্যাগ করেনি এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংস করাই তার কাম্য।

এই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় হিসেবে এম এন লারমা জুম্ম জনগণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জুম্ম জনগণও এ যাবৎ জনসংহতি

সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করে আসছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে জুম্ম জনগণের সংগ্রামী ভূমিকা ও সুদৃঢ় ঐক্য নিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

জুম্ম জনগণের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তোলার জন্য এম এন লারমা প্রগতিশীল চিন্তাধারাকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু জুম্ম সমাজে বহু আগে থেকে সামন্ত চিন্তাধারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। তাই জুম্ম সমাজ এই সামন্ত চিন্তাধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু এই চিন্তাধারা মোটেও সংগ্রামী নয়। তাই সমাজে এই চিন্তাধারা সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে না। ফলে জুম্ম সমাজকে এই চিন্তাধারা অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারেনি। বরঞ্চ বিভিন্ন সময়ে আপোষমুখী হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে।

অপরদিকে জুম্ম সমাজে ব্যবসায়িক অর্থনীতি বিকাশ লাভ করতে পারেনি। সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বহিরাগত বাঙ্গালীদের করতলগত। এই কারণে জুম্ম সমাজে ব্যবসায়িক চিন্তাধারা শক্ত ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারেনি। এই ভিত্তির অভাবে ব্যবসায়িক চিন্তাধারাও জুম্ম সমাজে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় না। তাই এই সমাজকে নেতৃত্ব দিতে প্রয়োজন প্রগতিশীল চিন্তাধারায় সুসজ্জিত হওয়া। কিন্তু সামন্ত চিন্তাধারা ও ব্যবসায়িক চিন্তাধারা সমাজে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম না হলেও নিজেদের উপস্থিতির কারণে নানাভাবে সমাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । এই কারণে জুম্ম জনগণের মধ্যেকার ঐক্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে - সামন্ততান্ত্রিক ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা যেমনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তেমনি উগ্র জাতীয়তাবাদও নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই দুই চিন্তাধারা প্রগতিবিরোধী এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল। এই সব চিন্তাধারা জুম্ম সমাজে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ঐক্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

কারণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা শুধুমাত্র নিজের ক্ষুদ্র জাতির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় এবং অপরাপর জাতিগুলোকে হিংসার চক্ষে দেখে এবং সন্দেহ পোষণ করতে অভ্যস্ত। অপরপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদ ছোট ছোট জাতিগুলির স্বার্থকে উপেক্ষা করে এবং বড় জাতিসুলভ দাম্ভিকতা নিয়ে কাজ করে। এই চিন্তাধারাও জাতিগুলোর মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতিতে সন্দেহ প্রকাশ করে; প্রয়োজনে বাঁধা প্রদান করে। কিন্তু এই চিন্তাধারা চূড়ান্ত বিচারে অবশ্যই বিপদগ্রস্থ হবে। বিশেষতঃ পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচনের সময় এই চিন্তাধারাগুলোর শোচনীয় পরিণতি দেখা দেবে। কারণ জেলা পরিষদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর আসন বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সব আসনে নির্বাচন করার সময় জাতিগুলোর জন্য নির্বাচনী এলাকা সংরক্ষিত হবে সত্য কিন্তু পার্বত্য সমাজের বাস্তবতা এমনভাবে গ্রথিত যে একটা জাতি আরেকটা জাতির সাথে কি ভৌগোলিক কি সামাজিক সবক্ষেত্রে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে একটা জাতি আরেকটা জাতিকে বাদ দিয়ে নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে পারবে না। তখন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীরা যেমনি অন্য জাতির সমর্থন লাভে সক্ষম হবে না তেমনি উগ্র জাতীয়তাবাদীরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর সমর্থন পাবে না। নির্বাচনের এই প্রক্রিয়া প্রমাণ করবে যে মহান নেতা এম এন লারমার নির্দেশিত প্রগতিশীল চিন্তাধারা ব্যতীত জুম্ম জাতির ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় টিকে থাকা।

ইস্পাত কঠিন ঐক্য অর্জনে আরো এক ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আজকাল চুক্তি বিরোধী নাম দিয়ে কিছু সংখ্যক উদভ্রান্ত ভবঘুরে যুবক নতুন রাজনৈতিক ও সামরিক ফ্রন্ট তৈরীতে ব্যতিব্যস্ত। তারাও সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ঘোরতর সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - জুম্ম জনগণ যখন সশস্ত্র আন্দোলন করেছিল তখন তারা অস্ত্র হাতে নিতে সাহস করেনি। তখন তাদের চেষ্টা ছিল পরিস্থিতির সুযোগে ভূঁইফোড় নেতা বনে যাওয়া। আর জুম্ম জনগণ যখন শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে প্রস্তুত হয়েছে তখনই এইসব চেলাচামুন্ডারা ক্ষুদে অস্ত্র হাতে নিয়ে অস্ত্রবাজী করতে উদ্যত হয়েছে। এটা জনগণের রাজনৈতিক চেতনার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জুম্ম জনগণ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনে চাঁদা দিয়ে যখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তখনই তথাকথিত চুক্তি বিরোধীরা নূতনভাবে জনগণের উপর চাঁদার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা জুম্ম জনগণের কাছে একেবারেই অসহনীয় ব্যাপার। যা কিছু জনগণের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না তা কখনো প্রগতিশীল হতে পারে না। জনগণ যা সমর্থন করে না সেটা অবশ্যই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাই তারা ইতিমধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসকগোষ্ঠীর বি টিমে তথা দালালে পরিণত হয়ে পড়েছে। তাই তারা বিশ্রামরত লোকদেরকে সুযোগ পেলে ছারপোকার মতই কামড় দেয় অথচ আগ্রাসী শক্তিকে আঘাত করতে সাহস করে না। বর্তমানে জুম্ম জনগণের ভূমি উদ্ধারের সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠেছে কিন্তু সেখানে এই চুক্তি বিরোধী স্বঘোষিত নেতাদের এ ব্যাপারে কোন কর্মসূচী নেই, কোন বক্তব্যও নেই। জুম্ম জনগণকে আজ নিজের জন্মভূমিতে সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র চলছে। এর প্রতিবাদে সর্বস্তরের জনগণ আজ যেখানে সোচ্চার, সেখানে এই চুক্তি বিরোধী মাতব্বরেরা সৈন্য বেশে যুদ্ধংদেহী কিন্তু পোষমানা পশুর মতোই নীরব। তাদের এই মুখোশ উন্মোচিত হবার পর জনগণ মনে করে এই চুক্তি বিরোধীরা এখন গৃহপালিত পশুর মতোই আচরণ করছে। তাদের রাজনৈতিক পরিণতি আর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের পরিণতি একই অন্ধ কানাগলিতে গিয়ে শেষ

হতে বাধ্য।

এসব ছাড়াও আরো দুটো কথা না বলে বর্তমান পরিস্থিতির কথা শেষ করা যায় না। সরকার একদিকে বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে অন্যদিকে বনায়নের নামে এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের নামে পার্বত্য ভূমি অবৈধভাবে অধিগ্রহণ করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর একই সাথে কাপ্তাই বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এমনিতে চলতি বছরেও জলেভাসা জমির চাষে এই কাপ্তাই বাঁধ মারাত্মক আঘাত হেনেছে। তার উপর আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিচ্ছে না। এই সব বিষয় জনগণের নিত্য দিনের সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে সরকারের যেমন কোন মাথাব্যথা নেই তেমনি মাথাব্যথা নেই চুক্তিবিরোধীদের, তেমনি নেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীদেরও।

এই অবস্থায় এম এন লারমা ব্যতীত জাতির কর্ণধার কে হবে?

যে যত আদর্শবান সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শী হতে পারে

- এম এন লারমা

সদানন্দ চাকমা সুহৃদ

অগ্রন্থিত অহংকারে

জুম্মবী, কী সব খুঁজে ফেরো আমার চোখের তারায়?
তোমার ধূলোমলিন পোর্ট্রেট? আমার প্রিয় তানপুরা?
হার্টথ্রব কোন যুবক? ফেরারী প্রজাপতি?
গৃহযুদ্ধের ট্র্যাজেডি?
ফায়ার ব্রিগেডের অবিরাম মহড়া? বসনিয়া, কসোভো, লোগাং গণহত্যা?
কবিতায় চিত্রকল্প? নিষিদ্ধ মাদকতা?
মার্সিডিজ-পাজেরো গাড়ির বহর?
মার্কস-এঙ্গেলস এর 'পুঁজি'? স্রেফ কিছু স্বপ্ন?
তোমার আমার চম্পক নগর?
নিতে চাইছো না দিতে চাইছো?
কম চাইছো না বেশি?

কী তোমার চোখের ফিলোসফি? তোমার নিজস্ব ক্যানভাসে
আমাকে প্রতিদিন যেমন ইচ্ছে আঁকতে পারো
আমাকে তুমি যা খুশি ভাবতে পারো
আমাকে ভাবতে পারো ব্যঙ্গচিত্র
আমাকে ভাবতে পারো পুরোদস্তুর ফসিল
আমাকে ভাবতে পারো নির্মীয়মান ভবনের ছাদ
আমাকে তুমি ভাবতে পারো সামন্তপ্রভু
আমাকে তুমি ভাবতে পারো লীপ ইয়ারের সকাল
আমাকে তুমি নির্দ্বিধায় ভাবতে পারো অতি বেগুনী রশ্মি, চেরী ফুল,
কম্পিউটার ভাইরাস, গ্যাস কোম্পানীর শ্রমিক কিংবা নোবেল বিজয়ী।

তবে নিশ্চিতভাবেই তোমার সেই মানুষটি আমি নই
যিনি পৃথিবীকে পুঁজিয়ে দিতে পারেন তোমার হাতের মুঠোয় ;
মুহূর্তেই পাল্টে দিতে পারেন তোমার আকাশের রঙ
আমি পারি না এ আমার অক্ষমতা
আর ঠিক এখানেই তোমাকে হারিয়ে ফেলি
এবং আমি মুছে যাই তোমার বর্ধিত সিলেবাস থেকে।
আমার কাছে অনেক কিছুই আজ বাহুল্য
প্রথমতঃ আমাকে আমার মতো করে দাঁড়াতে হবে
আপন স্পর্ধায় এখানে ; তার আগ পর্যন্ত সব অহংকার মিথ্যে
আমি অনেক কিছুই খুইয়েছি, আর খোয়াতে চাই না
অন্ততঃ ডাইনোসর হতে পারবো না
দুঃখিত, আসলে আমি তোমার রং নাম্বারের কণ্ঠস্বর।

জুমের দেশে তাঁকে ফিরে পেতে হবে আবার

সঞ্জীব দ্রং

কার্তিকের এক বৃষ্টি মুখর রাতে আত্মঘাতী হামলায় যেদিন নিহত হলেন পাহাড়ী মানুষের প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন কি পাহাড় জুড়ে অরণ্য জননী কেঁদেছিল তার প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে? কাপ্তাই হ্রদের জলে বিলীয়মান তাঁর শৈশবের মহাপুরুম নদী ও গ্রাম, পাহাড়ী মানুষের বিজু-সাংগ্রাই-বৈসুক উৎসব, পাহাড় দেশে ঋতুর পরে ঋতুর ফিরে আসা, ফুরামোন পাহাড়, হ্রদের জলে ভাসা পাখি, দূরে লুসাই পাহাড়, উড়ে যাওয়া মেঘ, মাচাং ঘরে উদাস কোনো বধূ, পাহাড়ের বুকে জুম ক্ষেত, পায়ে চলা পথ, পাহাড় বেয়ে আসা ঝরণা, বনের পাখি সকলে কি কেঁদেছিল তাঁদের নেতার জন্য? শংখ-চেংগী-মাইনী-লোগাং-কাচালং নদীর স্রোত কি বয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক? এত বড় আত্মহননের পর? নেতৃত্ববিহীনতায় কিছুদিনের জন্য মৌন হয়ে গিয়েছিল কি তারা?

এই মহান নেতা ও মানুষ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আমি নিজ চোখে দেখতে পাইনি। কিন্তু তাঁর কথাগুলো, জাতীয় সংসদে ছাপার অক্ষরে রয়ে যাওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলো আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ি, কথাগুলোর মধ্যে দাগ নেই, আর ভাবি, তাঁর মতো করে তো পাহাড়ী আদিবাসী মানুষের অধিকারের কথা কখনও কেউ বলেননি এ দূর্ভাগা দেশে। জনমবঞ্চিত দুঃখী পাহাড়ী মানুষ যাতে তাদের নিজ গ্রামে, নিজ এলাকায়, জন্মভূমি পাহাড়ে মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, জুম্ম জননী যাতে সন্তানদের নিয়ে যুগ যুগ ধরে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকতে পারে, পাহাড়ী জনগণের স্বতন্ত্র সত্তা যেন টিকে থাকে - এ জন্য একাই লড়ে গিয়েছিলেন তিনি জাতীয় সংসদে। বাঙালী সংসদ সদস্যদের শত বাধার মুখেও কত কথা বলেছেন তিনি ঐ অল্প সময়ে পাহাড়ী মানুষের অধিকারের জন্য। সংসদে তখন অগণন বাঙালী সদস্য, বাঙালী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, হুইপ - সব। ১৯৭২ সালের ২ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, ''মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি এখন এই ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের পরে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করার জন্য এখানে একটি সংশোধনী এনেছি। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এটা পাঠ করছি। আমি প্রস্তাব করছি যে, ৪৭ অনুচ্ছেদের পরে নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হোক। **পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে।**''

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি জাতিসত্তার অধিকারের কথা বলার জন্য এখানে স্পীকার মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বলছেন, ''দুই মিনিট সময় আপনাকে দেওয়া হলো। বলুন।'' এই-ই তো ছিল জাতীয় সংসদে পাহাড়ের এই মানুষের অবস্থা। নিজের জাতিসত্তা সম্পর্কে এত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য তাকে স্পীকার সময় দিয়েছেন মাত্র দুই মিনিট। বাঙালী জাতীয়তাবাদে টগবগ করা সদস্যদের এইতো ছিল আচরণ পাহাড়ী মানুষ সম্পর্কে। তবুও অনেক কথা তিনি বলেছেন সংসদে। একাকী তিনি রীতিমত যুদ্ধ করেছেন 'সংসদ যুদ্ধক্ষেত্রে', আদিবাসী পাহাড়ী মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও সংস্কৃতির কথা, জীবনের আবেদন-আবেগের কথা বলে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথা সম্মিলিতভাবে শোনেনি শাসকগোষ্ঠী, তাঁর কথার মূল্য দেয়নি তারা। যেদিন সংবিধানে জুম্ম জাতিসত্তার অপরিচয়ের বিল পাশ হয়ে গেল এবং তাঁর কথাগুলোকে চূড়ান্ত দম্ভ আর অহংকারে এবং চূড়ান্ত অজ্ঞতায় শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে কণ্ঠভোটে নাকচ করে দেয়া হলো, মনে অনেক বেদনা ও কষ্ট নিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাঙামাটি চলে গিয়েছিলেন, আর প্রিয় মাতৃভূমিতে গিয়ে প্রিয়জনদের কাছে পেয়ে শিশুর মতো কেঁদেছিলেন এবং বলেছিলেন আমাদের সব আশা শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ের ইতিহাস তো সকলেই জানেন। দীর্ঘ দুই যুগের এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাস, জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য এক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবার পর পূর্বপুরুষের পবিত্রভূমি রক্ষার জন্য পাহাড়ী মানুষের এই মুক্তিযুদ্ধের সময়েই সশস্ত্র সংগ্রামের একটি পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করা হয় ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এক কালো রাতে, তিনি আর পাহাড় দেশে ফিরে এলেন না।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বাবা শ্রী চিত্ত কিশোর লারমাও তাঁর পরিবার নিয়ে জন্মভূমি ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন কাপ্তাই বাঁধের কারণে। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে পানছড়ির দিকে উদ্বাস্তু মানুষের মিছিলে সামিল হয়েছিলেন তাঁরাও। আমার মনে হয় একটি 'জুম দেশে'র স্বপ্ন দেখতেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, মহাপুরুম গ্রামের অতি সাধারণ পাহাড়ী পরিবারের এক অসাধারণ যুবক। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'রাজা', 'দেওয়ান', 'চৌধুরী' কত খেতাব পাওয়া ধনী মানুষেরাই তো ছিলেন! কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি, তার মতো করে সাধারণ জুমিয়া মানুষের জন্য তেমন করে কেউ ভাবেননি, জুমিয়া কৃষকদের দুঃখ তাঁর মতো করে কাউকে স্পর্শ করেনি। চিরবঞ্চিত জুম্ম জনগণের

ওপরে শাসকশ্রেণীর বিরামহীন শোষণ তাঁকে যেন বিচলিত করে তুলেছিল। আমি জানি, অনেকেই শুরুর দিকে তাঁকে সমর্থন করেননি, অনেকে বিরোধীতাও করেছেন। তবুও তাঁর বুকের গভীরে মানুষের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের স্বপ্ন ছিল, দৃঢ় আদর্শ ছিল তাঁর মধ্যে। কী চেয়েছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা? খুব বড়ো অসম্ভব কোনো স্বপ্ন তো ছিল না তাঁর মধ্যে। বাংলাদেশের বিশাল সংবিধান নামক খাতায় কিছু শব্দ যোগ করতে চেয়েছিলেন নিজের জাতিসত্তার সম্পর্কে? খুব বেশী চাওয়া ছিল কি সেটা সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকার? একটি গণতান্ত্রিক দেশের এ কেমন সংবিধান যেখানে তার নাগরিক ৪৫টি জাতিসত্তা সম্পর্কে একটি শব্দ বা একটি লাইনও লেখা নেই? এই সংবিধান নিয়ে খুব বেশী কি গর্ব করতে পারি আমরা? তিনি চেয়েছিলেন একটি শোষণহীন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, যেখানে পাহাড়ী মানুষেরাও মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে, যেখানে পাহাড়ের মানুষ জন্মভূমিতে পরম শান্তিতে তাদের সহজ সরল জীবন কাটাতে পারবে। নিশ্চয়ই খুব ছোট্ট ছিল সে স্বপ্ন, যেখানে জুম্ম জননী তার পূর্বপুরুষের কাছে শোনা মুখে মুখে চলে আসা গল্প বলবে তার আদরের সন্তানকে পাহাড় দেশে। বিজু-সাংগ্রাই-বৈসুক উৎসবে পাহাড়ী মানুষ নিরুপদ্রবে আনন্দ করতে পারবে, দীঘিনালার পথে কোনো পাহাড়ী যুবতী আর লাঞ্ছিত হবে না, সেটেলাররা দলে দলে লোগাং, কাউখালী, মাটিরাঙ্গা, লংগদু, নানিয়ারচর, গুইমারা পাহাড়-বনভূমি দখল করে নেবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল থানা সদর ও জেলা সদরে শুধু বাঙালী মানুষের মুখ দেখা যাবে না, পাহাড়ের বাজার-দোকানপাটে শুধু সেটেলার দেখা যাবে না, জুম ক্ষেতের মাচাং ঘর থেকে পাহাড়ী যুবতীকে কেউ অপমান করতে পারবে না, মুখে হাসি থাকবে পাহাড়ী মানুষের, জুম ক্ষেতে ফসল হবে, পেঁপে-মারফা-ধান-লেবু-সবজি আরও কত কি! সে সব দ্রব্যের মূল্য পাবে জুমিয়া কৃষক, সুখ থাকবে পাহাড়ী মানুষের জীবনে, আর অন্যেরা তাদের সম্মান করতে শিখবে, পাহাড়ের শিশুরা মনের আনন্দেই স্কুলে যাবে, স্কুলে তাদের গল্প বলা হবে, স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করতে পারবে পাহাড়ের সন্তানেরা - এইতো চেয়েছিলেন পাহাড়ের এই বিশাল মানুষটি। গেংগুলিরা হয়তো আবার ফিরে আসবে গ্রামে তাদের পালাগান নিয়ে, রচিত হবে নতুন ইতিহাসের গান, কাপ্তাই বাঁধের কারণে জুম্ম জনগণের দুঃখের দীর্ঘ পালাগান, প্রতিবাদের সংগ্রামী গান।

কী চেয়েছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা? জন্মভূমি পাহাড়ে আর অরণ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে দেয়া যুক্ত স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী মানুষের জন্য স্বশাসনের কথা বলেছিলেন? গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেছিলেন? পূর্ব পুরুষের রেখে যাওয়া বিস্তীর্ণ পাহাড় আর অরণ্যভূমি, জুমক্ষেত, পাহাড়ী নদী, পায়ে চলা পথ, বাগান-বাগিচা, শ্মশানঘাট, সমাধিভূমি যাতে কোনদিন কেউ কেড়ে নিতে না পারে, পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন যাতে কেউ মুছে দিতে না পারে, অশুচি অপবিত্র করতে না পারে - এই তো ছিল তার চাওয়া।

বড় কঠিন বৈরী সময়ে জন্মেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মহাপুরম গ্রামে। সঠিক ও সাহসী নেতৃত্বের সংকট তখন সমাজে। তিনি জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য, জুম্ম জননী, শিশুদের ও মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করতে করতে জীবন দিয়েছেন। তাঁর সংসদীয় বক্তৃতাগুলো পড়ে আমার অবাকই লাগে, সেই সময়ে তিনি পাহাড়ী জাতি সম্পর্কে, পাহাড়ী জাতির বাইরে দেশের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষ সম্পর্কে, তাদের অধিকার সম্পর্কে কত কথা বলেছেন সংসদে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর মতো বিশাল মানুষের, দার্শনিক মানুষের মূল্যায়ন হয়নি। আমি মাঝে মাঝে আমার বাঙালী বন্ধুদের রসিকতা ছলে বলি, পাহাড়ের মানুষেরা এই দেশ পরিচালনা করলে বোধ করি দেশের এই করুণ দশা হতো না। বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে আখ্যায়িত হতো না?

এখন আমাদের কাজ করে যেতে হবে তাঁর স্বপ্ন পূরণের জন্য, পাহাড়ী জাতির মুক্তির জন্য। রাঙামাটির বিস্তীর্ণ হ্রদের জল, হাজার হাজার একর জমি, ধানী জমি, পাহাড়ী গ্রাম ফিরে পেতে হবে আবার। যতবার আমি রাঙামাটি আসি, হ্রদের জলে নামি, তাকিয়ে দেখি লুসাই পাহাড়ের দিকে, পাহাড়ী গ্রামের দিকে যাই, আমার খুব কষ্ট হয়। আমার মনে হয়, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মা যেন কাঁদছে, তাঁর ক্রন্দনধ্বনি আমি শুনতে পাই, যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে কথা বলেন তিনি, তাঁর আত্মা কষ্ট পায়, আমাদেরকে যেন বলে 'সব ফিরে পেতে হবে আবার', আগের মতো। এই বিস্তীর্ণ হ্রদের জল ও জমি, বিস্তীর্ণ পাহাড়, ফুরামোন পাহাড়, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা গ্রাম, জুম ক্ষেত, পায়ে হাঁটা পথ, মাইনী-লোগাং-শঙ্খ-চেঙ্গী নদীর দুই কূল - সব ফিরে পেতে হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষের আত্মা এখন খুব কষ্টে আছে, আত্মারা যেন হাহাকার করে বেড়ায়, আর্তনাদ করে ঘুরে বেড়ায়। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। একমাত্র লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই, নিজেদের সময়কে, এই বর্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য, জন্মভূমির জন্য, পাহাড়ী জননী-শিশুদের জন্য নিবেদন করার জন্য প্রস্তুত করার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অসংখ্য জুম্ম বীর যোদ্ধা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন চিরদুঃখী, বঞ্চিত জুম্ম জাতির জন্য। এই বীর সন্তানেরা লড়াই সংগ্রাম না করলে, নিজেদের যৌবনকে, জীবনকে নিবেদন না করলে বহু আগেই হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামও গারো পাহাড়ের মতো চিরদুঃখী হয়ে যেত এবং সে দুঃখ চিরস্থায়ী রূপ নিতো। পাহাড়ী মানুষের পরম সৌভাগ্য যে,

মহাপুরম নামক গ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একদিন জন্মেছিলেন।

যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সুদীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর, যেখানে সীমিত আকারে হলেও স্বশাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এ চুক্তিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য তো এখন কঠিন কাজ করে যেতে হবে। সকলেই জনসংহতি সমিতিকে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে, হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিশ্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন - এ আশা করবো। Divide and Rule অর্থাৎ ভাগ করো এবং শাসন করো - এই নীতির কথা সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে। আবার যেন আমরা ভাইয়ে-ভাইয়ে, পাহাড়ীতে-পাহাড়ীতে বা জুম্মতে-জুম্মতে নিজেরা আত্মঘাতী সংঘাতে অবতীর্ণ না হই। আমরা যেন আমাদের জুম্ম আদিবাসী জাতির বৃহৎ স্বার্থের জন্য সবাই মিলে কাজ করতে পারি। তখনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মা শান্তি পাবে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন শোষণহীন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, একটি 'জুম দেশ' প্রতিষ্ঠার, যেখানে পাহাড়ী জননী-শিশু-মানুষ তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে, সে সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তাঁকে সত্যিকার স্মরণ করা সম্ভব, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখানো সম্ভব।

একদিন 'দেশহীন মানুষ' নামের কলংক যেন আমাদের দূর হয়, যেন আপনাদের পাহাড় অঞ্চলে, রাঙামাটির বিস্তীর্ণ হ্রদের জলে, লোগাং, লংগদু, শংখ, মাইনী, চেংগী, মহাপুরম নদীর কোলে যেন জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার যেন গেংগুলিরা আমাদের জীবনে ফিরে আসে শুধু প্রেম ভালবাসার পালাগান নিয়ে নয়, সংগ্রামের বিপ্লবের গান নিয়ে, প্রেরণার গান নিয়ে, পাহাড়ী যুবক-যুবতী যেন রাতভর উৎসবে আসতে পারে, আগেকার দিনের মতো নাচতে গাইতে পারে, আনন্দ করতে পারে; পাহাড়ী মায়ের মুখে তার সন্তানকে গল্প বলার দিন যেন ফিরে আসে, আর যেন কল্পনা চাকমার মতো মেয়েরা রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়ে না যায়, দীঘিনালার পথে যেতে যেতে, বাবুছড়া বাজারে গিয়ে কোনো পাহাড়ী নারী যেন আবার লাঞ্ছিত না হয়, গ্রামের জুমিয়া যুবক-যুবতী যেন মনের আনন্দে নিরাপদে জুম ক্ষেতে কাজ করতে পারে, মাচাং ঘরে বাস করতে পারে, দুজনে ভালো লাগার ভালোবাসার কথা বলতে পারে, এরকম সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ার জন্যই লড়াই করেছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আসুন তাঁর স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠিন কাজে ব্রতী হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে ভালোবাসি।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

জুম্ম জাতির স্বাধীকার আন্দোলনে গিয়েছিলে তোমরা,
প্রিয় আবাস ছেড়ে, জীবনের মায়া ত্যজি স্বেচ্ছানির্বাসনে।
বাবা-মা নির্বাক রয় চেয়ে, প্রিয়তমা অশ্রু মোছে খাদিতে।
বাবা-মা জানায় সজল নেত্রে - ''যত আশীর্বাদ, মঙ্গল আছে
এ জগতে ওহ! ভগবান সবই থাকুক সন্তানের কল্যাণে''।
প্রিয়তমা সাঁঝে প্রদীপ জ্বেলে প্রার্থণায় বসে তোমাদের শুভ কামনার্থে।

রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, হিংস্র জানোয়ার মোকাবেলা করে
কাটাও তোমরা নিদ্রাহীনতায় দিনের পর দিন গহীন বনে,
হয়তো মেলে না খাবার; তীব্র ক্ষুধা নিয়ে থাকো অভুক্ত, তবুও-
'জুম্ম জাতি স্বাধীকার পাবে, ফুটবে মুখে হাসি' ভেবে হও আনন্দিত।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মনে পড়ে বাবা-মার স্নেহার্দ্র আকুল মুখ, হয়তো
উকিঝুকি মারে পিনোন খাদি পরা প্রিয়তমার ডাগর চোখ।
শত্রুর ঝাঁ ঝাঁ গুলিতে, দায়িত্ববোধে তোমরা হও সচকিত
বাবা-মা, প্রিয়তমার মুখ মুহূর্তেই হয়ে যায় বিস্মৃত।
তোমরা, দুর্গম-গিরি-কন্দর যাত্রী শোক ভুলে
সহযোদ্ধাদের লাশ কাঁধে বয়ে এগিয়ে যাও সামনে।
জুম্মদের স্বাধীকার আদায়ে প্রাণপণে যাও তোমরা লড়ে
তোমাদের তাজা তাজা প্রাণ ঝরে পড়ে শত্রুর বুলেটে।

বাবা-মা হারায় সন্তান, প্রিয়তমা হারায় তার প্রিয়তম,
সহযোদ্ধারা শপথ নেয়, 'স্বাধীকার আদায়ে লড়ব আমরা প্রাণপণ'।
সুদীর্ঘ ব্যাপী সংগ্রাম, তোমাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, যায়নি বৃথা
জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের সূর্য হাসছে খলখলিয়ে-
তোমরা যেমনটি করেছিলে আশা।
আমরা তোমাদের লাল সালাম জানাই গভীর শ্রদ্ধাভরে।
যুগ হতে যুগান্তরে তোমাদেরই জয়ধ্বনি, শ্রদ্ধাভরে ধ্বণিত
হবে এ পার্বত্যাঞ্চলে।

জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এম এন লারমার অবদান

শক্তিপদ ত্রিপুরা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংক্ষেপে এম এন লারমা একটি আন্দোলনের নাম। একটি আদর্শের নাম। একটি চেতনার নাম। এম এন লারমা জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন এবং শোষিত-বঞ্চিত মেহনতী মানুষের বন্ধু ছিলেন। তিনি সৎ ছিলেন, মহৎ ছিলেন এবং তিনি একজন সংগ্রামী বিপ্লবী নেতা ছিলেন। শ্রী লারমা ১৯৩৯ সালে রাংগামাটি জেলার মহাপুরম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রী চিত্ত কিশোর লারমা এবং মাতার নাম শ্রীমতি সুভাষিনী দেওয়ান। তাঁরা উভয়েই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। এম এম লারমারা তিন ভাই এক বোন। শ্রীমতি জ্যোতিপ্রভা লারমা চার ভাই বোনদের মধ্যে সবার বড়। তিনি এখনো বেঁচে আছেন এবং আন্দোলন সংগ্রামে এখনো সক্রিয় আছেন। শ্রী লারমার বড় ভাই শুভেন্দু প্রভাস লারমা ওরফে বুলু আন্দোলন সংগ্রামে একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা মূলক আক্রমণে এম এন লারমা ও বুলু লারমা উভয়েই শহীদ হন। ভাইবোনদের সবার ছোট শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি বড়ভাই এম এন লারমা শহীদ হলে জনসংহতি সমিতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং তিনি বর্তমান অবধি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জুম্ম জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

এম এন লারমা লেখাপড়া শুরু করেন নিজ গ্রাম মহাপুরম প্রাইমারী স্কুলে। প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে তিনি রাংগামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এই স্কুল হতে মেট্রিক পাশ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর তিনি চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে আইএ পাশ করেন। একই কলেজ হতে তিনি বিএ পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি বিএড ডিগ্রী নেন এবং ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশ করেন। এলএলবি পাশ করার পর তিনি আইনজীবি হিসেবে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন।

শ্রী লারমা ছাত্র জীবন হতে রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এ রাজনৈতিক শিক্ষা তিনি পারিবারিকভাবে পেয়েছিলেন। শ্রী লারমার পিতামহ চানমনি চাকমা একজন প্রগতিবাদী ছিলেন। তখনকার সময়ে তিনি সামন্ত শ্রেণীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। শ্রী লারমার পিতাও একজন প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও সামন্ত শ্রেণীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। শ্রী লারমার জ্যাঠা শ্রী কৃষ্ণ কিশোর চাকমাও একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ছিলেন। তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এসব মহান ব্যক্তিদের নিকট থেকে শ্রী লারমা শৈশব জীবন থেকে সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অধিকার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক জীবনেও তিনি এসব মহান ব্যক্তিদের নিকট থেকে আন্দোলন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। শ্রী লারমা ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম সরাসরি পাহাড়ী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯৫৭ সালের পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে রাঙ্গামাটিতে ঐতিহাসিক পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী লারমা দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনকে সামনে রেখে পাহাড়ী ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার যখন কাপ্তাই বাঁধের প্রস্তুতি নেয় চট্টগ্রাম কলেজের বিএ ক্লাশের ছাত্র শ্রী লারমা এর প্রতিবাদ করেন। কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী এম এন লারমাকে রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ দুই বছরের অধিক কারাবরণের পর তিনি ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ মুক্তি পান। গ্রেফতারকৃত অবস্থায় তিনি কারাগার থেকে ছাত্রদেরকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন এবং ছাত্রদেরকে সাহস ও ধৈর্য রেখে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ বার্তা পাঠাতেন। শ্রী লারমা কারাগার হতে মুক্তি পাবার পর শিক্ষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি নিজেই শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার জীবনে তিনি ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক চেতনায় জাগিয়ে তুলতেন এবং জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে সংগ্রামী, বিপ্লবী, দুরদর্শী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সৎ, মহৎ, মিষ্টভাষী, অমায়িক, ভদ্র, নম্র ছিলেন। তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন বলে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এর মতো গুরুতর জাতীয় বেঈমানদের ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জাতীয় বেঈমান কুলাঙ্গার গিরি-পলাশ-দেবেন-প্রকাশ এম এন লারমার ক্ষমাশীলতার সুযোগ নিয়ে জুম্ম জনগণের এই প্রাণপ্রিয় বিপ্লবী নেতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন। জুম্ম জনগণ ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরে তাদের প্রিয় সংগ্রামী নেতাকে হারালেন।

১৯৮৩ সালের এই দিনটি তাই জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে একটি কালো অধ্যায়। এদিন জুম্ম জনগণ যে নক্ষত্রকে হারালেন তা কোনদিন পূরণ হবার নয়। সেদিন জাতীয় বেঈমান কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র এম এন লারমাকে হত্যা করতে পেরেছিলেন কিন্তু লারমার চেতনাকে হত্যা করতে পারেনি। আজও এম এন লারমার চেতনায় উজ্জীবিত লক্ষ লক্ষ জুম্ম জনতা জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীসহ সকল প্রার্থীদেরকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু অখন্ড পাকিস্তান বেশীদিন টেকেনি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রকার নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন ১৯৭১ সালে এসে মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে। ১৯৭৩ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনেও তিনি সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন।

এম এন লারমা জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে সুসংবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনার কথা ভাবছিলেন। তাই তিনি একটা রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। জুম্ম জনগণ এই প্রচেষ্টার সুফল পেলেন ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীতে। এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হল জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বহু জাতিসত্ত্বার পার্বত্য ভূমি। এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষকে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে এনে সফল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সহজে মানুষের মন জয় করতে পারতেন। কারণ তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মিষ্টভাষী ছিলেন এবং সৎ, মহৎ ও ক্ষমাশীল ছিলেন। এইসব গুণাবলী সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতো। কোন ব্যক্তিই এম এন লারমার কোন প্রস্তাবে না শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না। তিনি সে ধরণের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রতর জাতিসত্ত্বাদের মানসিকতা বুঝতে পারতেন। সে কারণেই তিনি এইসব ক্ষুদ্রতর জাতিসত্ত্বাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের প্রতি শ্রী লারমার বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা ছিল।

১৯৭২ সাল। বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। সেদিন বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভাগ্য নির্ধারিত হতে যাচ্ছিল। সেদিন মহান সংসদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান উত্থাপিত হল। কি নির্মম পরিহাস! বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের কোন কথা উল্লেখ নেই, পাহাড়ীদের কোন স্বীকৃতি নেই। বরং বলা আছে - বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙালী নামে পরিচিত হবে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীরাও স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী মানুষের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ ছিল। আজীবন প্রতিবাদী ও সংগ্রামী নেতা এম এন লারমা মহান সংসদে এর প্রতিবাদ জানান এবং বলেন- 'একজন বাঙালী কোন দিন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপ একজন চাকমাও বাঙালী হতে পারে না।' মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বলিত আঞ্চলিক পরিষদ এর দাবী করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মহান সংসদে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের কথা বলেননি তিনি বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের, কৃষক-শ্রমিকের, কামার-কুমার, মাঝি-মাল্লা, তাঁতী-জেলেদের অধিকারের কথাও মহান সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আজকে বাংলাদেশে যে দাবী উঠেছে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা তিনি মহান সংসদে সেই নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথাও বলেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান সংসদে নারী মুক্তি ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন - ''সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে (সংবিধানে) নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।'' তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে নিষিদ্ধ পল্লীতে যেসব মেয়েরা দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে তাদেরকে সেই নরক যন্ত্রণা হতে বের করে এনে তাদের খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার জন্যও দাবী করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সেদিন এম এন লারমার কথা কর্ণপাত করেনি। কারণ তারা মনে করেছিল দেশ, রাষ্ট্র ও সংবিধান তাদের সম্পত্তি হয়ে গেছে। আজ এম এন লারমার কথাই বাস্তব প্রমাণিত হল। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আড়াই যুগেরও বেশী হয়ে গেল, কিন্তু এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত। এদেশে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। সেদিন যদি বাংলাদেশের সংবিধানে নারীসহ মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকতো তাহলে আজকে বাংলাদেশের মাটিতে এত খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, এসিড নিক্ষেপ, শীতবস্ত্রের অভাবে মারা যাওয়া, খাদ্যের অভাবে

মারা যাওয়া, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন ইত্যাদি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তাই কোন নারী যদি নির্যাতিত হয়, কোন নারী যদি এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়, কোন সংখ্যালঘু যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কর্তৃক নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়, কোন মানুষ যদি শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত হয় এবং দেশের মেহনতি মানুষ যদি মৌলিক মানবাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার হারায় তখন এম এন লারমার কথা মনে পড়ে যায়।

সত্যিই এম এন লারমা একজন মেহনতি মানুষের নেতা ছিলেন, নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের নেতা ছিলেন। সত্যিই তিনি সংগ্রামী ছিলেন, বিপ্লবী ছিলেন। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের নেতা ছিলেন বলে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের কথা, দেশের মেহনতি মানুষের কথা, নারী অধিকারের কথা বলেছিলেন এবং এদের পক্ষে আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সংখ্যালঘু, উচ্চ শ্রেনী-নিম্নশ্রেণী, নারী-পুরুষের বৈষম্যের অবসান চেয়েছিলেন এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শ্রী লারমা জীবিত অবস্থায় তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে দেখে যেতে পারেননি তবে বাংলাদেশের বুকে হোক বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হোক সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে এম এন লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেই। সংখ্যালঘু, নিপীড়িত, নির্যাতিত মেহনতি মানুষের জন্যে যুগে যুগে এম এন লারমা জন্ম লাভ করুক এবং সংখ্যালঘু ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক।

একজন বাঙালী যেমন কোনদিনই চাকমা হতে পারে না, অনুরূপ একজন চাকমাও কোনদিনই বাঙালী হতে পারে না

- এম এন লারমা

নভেম্বর চেতনা

তনয় দেওয়ান

আমরা জুম চাষ করতাম, পাহাড় আর পাহাড় জুড়ে,
আমাদের সমাজে অনিশ্চয়তার প্রলেপ লেগে থাকত,
পাহাড়ের সবুজ চূড়াগুলো নীলাকাশে তাকিয়ে থাকত,
কী যেন আশার আলোয় সে দিগন্ত কাঁপানো প্রলয়ে স্থির থাকত।

দানব প্রকৃতি আর হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণে
বজ্রের চেয়েও তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়ত জুম্ম শিশু।
বিপ্লবী লারমা,
রোদে পোড়া সভ্যতাহীন জুম্মদের
তুমি সচেতনতার প্রতীক।
তুমিই জয় করলে দানব প্রকৃতি
আর হিংস্র জানোয়ারদের।
গড়ে তুললে সংগ্রামের সঙ্গতি।
আমাদের সবুজ পাহাড়ে মনুষ্যরূপী ডোরাকাটা হায়েনার ঝাঁক,
আমাদের কিশোরীর কোলে তাদের পুরুষত্বের অভিশাপ।
বুটের তলায় নিষ্পেষিত আমাদের আজীবন মালিকানা,
নেই জীবনে শোষণ আর নির্যাতনের শেষ ঠিকানা।
মহান লারমা,
আমরা জানি সেদিন.....
তুমিই আমাদের বোঝালে শোষণের কথা,
তুমিই আমাদের মুখে দিলে প্রতিবাদের ভাষা।
তুমিই আমাদের বোঝালে জীবনটাই সংগ্রাম।
তুমিই আমাদের হাতে এনে দিলে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র,
তুমিই আমাদের দিলে নির্যাতন আর নিপীড়ন রুখার মন্ত্র।
তুমিই আমাদের দেখালে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পথ।
বিজয়ী লারমা, তুমি আজ ইতিহাস।
১০ নভেম্বর আজ ইতিহাস।
নভেম্বর আমাদের চেতনা।
সবাই আজ জুম্ম হয়ে উঠেছে নভেম্বর চেতনাতে।
নভেম্বর চেতনা মেঘে দিয়েছে বিদ্যুৎ,
সূর্যে দিয়েছে আলো,
আমাদের দিয়েছে বাঁচার সংগ্রাম।
নভেম্বর, একটা শোক। জাতীয় শোক।
নভেম্বর, শত শোক জ্বেলেছে চেতনার মশাল।
আমাদের অস্তিত্বের গ্যারান্টিতে তুমি।
নিশ্চিত জেনো বিভেদপন্থীদের দেব না ক্ষমা,
জয় হবে সংগ্রামী জুম্মদের.....
চেতনায় থাকবে লীডার লারমা।

মহান শহীদের শেষ বিদায়

জগদীশ চাকমা

অবশেষে মহান শহীদের শেষ বিদায়ের দিনটি এলো। সোমবার, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯২। নিজ কর্মস্থল থেকে আমি কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে বেদনাবিধুর মন নিয়ে রওনা দিলাম। লক্ষ্য করলাম সহকর্মী সকলের হৃদয় ভারাক্রান্ত অথচ আনন্দাপ্লুত। যেন এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করতে যাচ্ছি, সেই মহাপুণ্যের ভাগীদার ও অমোঘ ক্ষণটির সাক্ষী হতে চলেছি। জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে যে দিনক্ষণটি চির অম্লান হয়ে থাকবে।

কয়েকদিন যাবত থেমে থেমে বৃষ্টি হতে থাকলেও দিনটি ছিল পরিষ্কার। ভাদ্র মাসের কড়া রোদ্দুর নেই। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের আবছা ছায়ায় আমরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছি। আমদের দলে কয়েকজন সশস্ত্র সদস্য ছিল। তারা আগে আগে এগিয়ে চললো। সশস্ত্র সদস্যদের যাত্রা অন্যদের মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করলো। পথচারীরা দাঁড়িয়ে সকলকে দেখতে লাগলো। পথপার্শ্বে কর্মরত কৃষকরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলো। হয়ত তারা ভাবছিল দিনদুপুরে আমাদের কোন সশস্ত্র অভিযানের বিষয়ে। গ্রাম পেরিয়ে ছড়ায় নামলাম। কখনও ছড়ার জলস্রোত বেয়ে, কখনও ডাঙ্গায় হেঁটে এক ঘন্টা পর আমরা পৌছলাম গন্তব্যস্থলে। সেখানে আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যাত্রা পথে আমাদের মধ্যে নিরানন্দ আলাপ চলছিল। একজন বললো অত্যন্ত অনাড়ম্বরে শহীদদেরকে বিদায় দিতে হচ্ছে। তাও আবার দীর্ঘ নয় বছরে ও অত্যন্ত সন্তর্পনে। তাদের নিকট আত্মীয়রা আজ কোথায়! অন্যজন বললো, কি আর করা যায়, ভাগ্যের লিখন না যায় খন্ডন। আজ স্বাধীকার থাকলে এমনটি হতো না। ন' বছর আগে মহা ধুমধামে তাদের বিদায় দেয়া হতো। আমাদের সৌভাগ্য তাদের শেষ বিদায়ে শরীক হতে পারছি। তাদের আলাপে আমি সম্বিৎ পেলাম। বুঝলাম এতক্ষণ যেন আনমনে যন্ত্রের মত চলছি। সত্যি তা একদিকে দুর্ভাগ্য, অন্যদিকে বাস্তবতা। কোনটাকে সাঁই দেবো আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। সাঁইও দিলাম না। তাদেরকে বলতে দিলাম। আমিও নীরবে চলতে থাকলাম। কিন্তু তাদের ভাবাদর্শ আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। এলোমেলো নানা চিন্তা ও অস্পষ্ট কাল্পনিক দৃশ্যপট অবচেতন চোখের পর্দায় ভেসে উঠলো। মনে পড়লো সেই রক্তাক্ত, বিভীষিকাময় ১০ই নভেম্বরের কাল রাত্রির কথা। বন্দুক আর সঙ্গীন হাতে নিয়ে সেদিন চুপি চুপি এগিয়ে আসছে জিঘাংসা ও হিংসা-উম্মাদনায় দুরু দুরু বুকে বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতৃহন্তা প্রতিবিপ্লবীরা, তস্করেরা। অবশেষে হত্যা করলো জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমা সহ ৮ জন সহযোদ্ধাকে। তাদের ব্রাশ ফায়ারে প্রকম্পিত হলো নিভৃত বনাঞ্চল। মহান নেতা ও দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের রক্তে রঞ্জিত হলো অস্থায়ী ক্যাম্পের ধূসর মাটি। রচিত হলো বিশ্বাসঘাতকতার চরম কলঙ্ক কাহিনী। জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হলো এক কালো দিবস - ১০ই নভেম্বর।

আজ আমি মহান নেতার সহযোদ্ধা দেশপ্রেমিক আটজন শহীদকে বিদায় দিতে যাচ্ছি। সত্যি দুঃখ হয়, অত্যন্ত অনাদরে অনাড়ম্বরে তাদের বিদায় দিতে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? প্রথম বন্ধুর কথা মেনে নিতে পারলাম না। হঠাৎ করে বলে উঠলাম, না অনাড়ম্বর কেন? নিকট আত্মীয়ের কথাই বা কেন?

আমার 'না' শব্দে সহকর্মীদ্বয় হতচকিয়ে আমার দিকে তাকালো যেন তারা অপ্রস্তুত। আমি বললাম - কেন, আমরা তো সাধ্যমত চেষ্টা করে তাদেরকে বিদায় দিচ্ছি। আমাদের বাস্তবতার খাতিরে কেবল অনাবশ্যক আড়ম্বরতা বাদ দেয়া হয়েছে ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আর আমরাই তো রয়েছি তাদের আদর্শের নিকটতম আত্মীয়। কর্মী বন্ধুদ্বয় আমার কথাই সাঁই দিল। এভাবে নানা আলাপ করে আমরা অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

গ্রামেই অপেক্ষা করছিল শহীদদের শোকার্ত বিধবা স্ত্রী, পুত্র, ভাই-বোন ও নিকট-আত্মীয়রা। আমরা যথাসময়ে সেখানে দুপুরের খাওয়া ছাড়লাম। তারপর আবার রওনা দিলাম সেই মহাতীর্থের (সমাধি) উদ্দেশ্যে। সশস্ত্র সদস্যরা আগে পিছে এগিয়ে চললো। সকলেই মৌন-বিমর্ষ, বিদায়ের মর্মবেদনায় আবেগাপ্লুত। সবাই মহাতীর্থের মৌনযাত্রী। দু'একজন মৌনতা ভঙ্গ করে একান্ত আলাপে এগিয়ে চললো। ভাদ্রের ভরাদুপুরের রৌদ্র কারো ক্লান্তি এনে দিল না। ছড়ার উজানে পিচ্ছিল শিলাময় পথ কারো পায়ে এতটুকু ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না। কখনও হাঁটু ভিজা জলে কখনও পিচ্ছিল পাহাড় বেয়ে মৌন যাত্রীদল এগিয়ে চললো। অবশেষে পৌঁছলাম সেই মহাতীর্থ সমাধিস্থলে- যেখানে মহান শহীদরা দীর্ঘ ন' বছর ঘুমিয়ে ছিল।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের অগ্রনী বাহিনী সদস্যরা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। সেই মহাতীর্থে মহাশ্মশান প্রস্তুত করেছে। দুই সারিতে আটজন বিদায়ী মহান শহীদদের ৫ স্তরের উত্তর-দক্ষিণ বিদায় মার্গ

(রুবঘর) তৈরী করেছে। প্রতিটি মার্গে শহীদদের নাম কাগজে লিখে টাঙ্গানো ছিল। তারই পাশে মহান নেতার সমাধিতে সাজিয়ে রেখেছে মহান শহীদদের মরদেহের অস্থি-দন্ত। বাশের রথে (সমরেং ঘর/রাধাঘর) সাদা কাপড়ের উপর পর পর সাজানো-গোছানো রয়েছে পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), সৌমিত্র চাকমা, অর্জুন ত্রিপুরা এবং কল্যাণময় চাকমার অস্থি-দন্ত। সাদা কাপড়ে ঢাকা শহীদদের মাথার খুলি প্রায় অক্ষত, অস্থিগুলি প্রায় ঝরঝরে। অন্যান্যদের সঙ্গে আমি সমাধিস্থলে ঢুকে শহীদদের অস্থি-দন্ত দেখতে লাগলাম। তুফান ও মিশুকের গুলিবিদ্ধ মাথার খুলি সবচেয়ে ঝাঁঝরা, ঘাতকদের একটা গুলিও পাওয়া গেছে। আমার পাশে রিপনের বড় ভাই অস্থি-দন্ত দেখতে দেখতে স্মৃতিচারণ করে ফোটা ফোটা চোখের জল ফেলে বললো - তোমার কত ইচ্ছে ছিলো বাড়িতে যাওয়ার। কিন্তু যাওয়া হয়নি। সে আরো বললো - ঘটনার কিছুদিন আগে বাড়িতে যাওয়ার পথে আমার সাথে দেখা হয়। আমার সাথে কথা বলার পর আবার ফিরে আসে ব্যারাকে। তার আর যাওয়া হয়নি। এক শোকার্ত শহীদ পিতা শহীদ সন্তানের অস্থিগুলি নেড়ে দেখছিল। তার মনে কিসের ভাবনা এসেছিল জানি না। শেষে সে শহীদ সন্তানের কয়েকটি ক্ষয়িত দাঁত রেখেছিল স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। নিকট আত্মীয়রা এভাবে কয়েকজনের দাঁত রেখেছিল। দুই শহীদ পত্নী বিমর্ষভাবে দেখেছে শহীদ স্বামীদের মাথার খুলি ও অস্থি-দন্ত।

শেষ বিদায়ের এই বিদায় ক্ষণে তাদেরকে এত বিচলিত মনে না হলেও ন'বছর আগে সেই কালো দিনে তারা দিনের পর দিন কেঁদে কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছিল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। সহকর্মীদের হারিয়ে সকল জুম্ম বিপ্লবীরা অঘোরে কেঁদেছিল। কিন্তু এই শহীদ দুই পত্নীর দুঃখ ছিল সকলের চেয়ে বেশী। তারা হারিয়েছিল প্রাণপ্রিয় মহান স্বামীকে। একদিকে গৃহযুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি অন্যদিকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের জীবনকে করেছিল দিশাহারা। আজ তারা কাটিয়ে উঠেছে সেই শোক। কিন্তু ভুলে যায়নি জীবনের সেই সুখময় স্মৃতি বিজরিত মুহূর্তগুলো। জীবনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে এখনও জীবনকে হেচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত একদিন আসবে সেই স্বপ্ন ভরা দিন। শহীদ স্বামীর আমৃত্যু প্রেরণা ও আদর্শই আজ তাদের পাথেয়।

দুপুর বারোটার পর আবার শুরু হলো শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি পালা। চারজনের বাঁশের রথ ধরে একে একে শহীদদের শেষ অস্থি-দন্তকে সাজানো মার্গে উঠানো হলো। তারপর চন্দ্রতাপ (চান্দোয়াবাঁশ) টাঙ্গানো হল। সেই এক অপূর্ব দৃশ্য। শহীদ মার্গের উপরে শোভিত চন্দ্রতাপ। শহীদ অর্জুন ত্রিপুরার মার্গে দেয়া হলো পতাকা। এক ঐতিহাসিক মহাশ্মশান রচিত হলো। মহাশ্মশানের মার্গস্থিত শহীদদের প্রত্যেকের ছবি নেয়া হলো। আমিও নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অনেকের সাথে ফটো তুললাম। তারপর শহীদদের মহান অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ দু' মিনিট মৌনতা পালন করা হল দু'সারিতে দাঁড়িয়ে। এরপর মহান শহীদদের সম্মানে দৃপ্ত সদস্যরা জি-থ্রি রাইফেল নিয়ে শেষ সালাম জানালো। বিদায়ের শেষ ক্ষণটি এগিয়ে এলো। শুরু হলো মার্গস্থিত শহীদদের শেষ দর্শনের পালা - চারদিকে প্রজ্জলিত বহ্নিশিখা নিয়ে ৫ বার প্রদক্ষিণ। আমিও অবচেতন মনে মহাশ্মশানের চারদিকে ৫ বার ঘুরলাম। এরপর শহীদমার্গে অগ্নি প্রজ্জলন - আগুন দেয়া। এক মহাপুণ্যের অংশগ্রহণ। প্রত্যেকে প্রজ্জলিত শিখা নতমস্তকে শহীদমার্গে চেপে ধরলো। একে একে শহীদমার্গ প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। ধোঁয়ার কুন্ডলী সারা আকাশ ছেয়ে ফেললো। প্রজ্জলিত অগ্নি শিখা আস্তে আস্তে গ্রাস করতে থাকলো মহান শহীদদের ঝরঝরে অস্থি-দন্ত।

প্রজ্জলিত মহাশ্মশানের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে এক শোকপূর্ণ আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। মনে মনে বললাম - মহান শহীদ ভাইয়েরা, তোমাদের সাথে আমার কোন পরিচয় নেই। তোমাদের কোনদিন দেখিনি, আর দেখবোনা। আজ দেখলাম তোমাদের দেশপ্রেমের মন্ত্রপুত অস্থি-দন্ত। ন' বছর আগে বিদায় নিলেও তোমাদের শেষ বিদায় জানানোর সৌভাগ্য আমার হল। এবারে তোমরা চলে গেলে। কিন্তু রেখে গেছ অপূর্ব দেশপ্রেম আর আদর্শ। তোমাদের সেই দেশপ্রেম ও আদর্শই আমাদের পাথেয়। আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমাদের আদর্শচ্যুত না হই। তোমাদের ভুলে না যায়। আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ করো।

শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ জীবন ও সংগ্রাম

সালাম আজাদ

শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জুম্ম জনগণ ও মেহনতী মানুষের মুক্তির অগ্রদূত। তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। তাঁকে আমি কখনো দেখিনি। এটা আমার জীবনে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা। শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংস্পর্শে আসা পরম সৌভাগ্যের। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাদেরকে আমি যেমন ঈর্ষা করি, তেমনি তাদেরকে সৌভাগ্যবান মানুষ মনে করি। তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে এম এন লারমার সংস্পর্শে না আসার বেদনা আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। কেন এই কষ্টবোধ সে বিষয়ে আলোচনার আগে এই লেখার একটু ভূমিকা দেয়া প্রয়োজন। শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কে জানতে হলে আগ্রহী পাঠকদের একটি বড় সমস্যায় পড়তে হয়। এজন্য যে, বিভিন্ন কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও কর্ম নিয়ে তেমন কোন বই ম্যাগাজিন পত্রিকা সহজলভ্য নয়। তাঁর জীবনী আজ পর্যন্ত বের হয়নি এটা সত্যিই এদেশের মানুষের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের। বাংলা একাডেমী থেকে প্রতিবছর কত খ্যাত অখ্যাত মানুষের জীবনী প্রকাশিত হয় এবং তার অধিকাংশই বিক্রির অযোগ্য বলে বছরের পর বছর ধরে গুদামে প্যাকেট বন্দী হয়ে আছে।। কিন্তু বাংলা একাডেমী থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জীবনী আজো কেন বের হলো না তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু দিবস সামনে রেখে যখন তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখবো বলে স্থির করেছি তখন বড় বিপদের মধ্যে পড়ে যাই। তাঁর সম্পর্কে কোন বই পুস্তক না পাওয়ার কারণেই এই বিপদাপন্ন অবস্থা। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অনুজপ্রতিম পলাশ খীসা এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন সময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নিয়ে যে সব রচনা তৈরী হয়েছে তার অনেকগুলিরই ফটোকপি পলাশ আমাকে সংগ্রহ করে দেন। আজকের এই লেখা পলাশ খীসা কর্তৃক সরবরাহকৃত সেইসব লেখা পড়ার পরেই লেখা সম্ভব হচ্ছে। শুরুতে লেখকদের কাছে ঋণ স্বীকার করে নিচ্ছি, সেই সঙ্গে পলাশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যাশা করছি ন্যায়নিষ্ঠ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান পলাশ খীসা আগামী দিনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শকে সমুন্নত রাখবেন।

শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সততা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। আজকের এই অবক্ষয়ের যুগে তাঁর মত সৎমানুষের কথা ঘুরে ঘুরে মনে পড়ে। এই সৎ ও মেধাবী মানুষটি রাঙ্গামাটির মহাপুরম নামক যে গ্রামে ১৯৩৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সে গ্রামটি এখন কাপ্তাই লেকের অথৈই জলের তলায় ঘুমিয়ে আছে। সেই জলের তলায় ঘুমিয়ে আছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ওরফে মঞ্জুর অসংখ্য পায়ের চিহ্ন। তাঁর বাল্যকাল, শৈশব যা মানুষের জীবনে সবচেয়ে প্রিয় সময়। মঞ্জুর মত হাজার হাজার পাহাড়ী নারী-পুরুষ শিশুর পদচিহ্ন কাপ্তাই লেকের গভীর জলরাশির তলায় ঢুকরে কেঁদে ওঠছে। এই কান্না কি একদিন ফুঁসে ওঠবে না? নিশ্চয়ই ওঠবে। তখন তা অবদমিত করা যাবে না বলেই আমি বিশ্বাস করি।

নিজের বসতভিটা হিংস্র থাবার করাল গ্রাসে হারিয়ে যাবার পর পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা ও মা শুভাষিনী দেওয়ান রাঙ্গামাটি থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে চলে আসতে বাধ্য হন। চার সন্তান যথাক্রমে জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু), শুভেন্দু প্রভাস লারমা (বুলু), মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু) এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লরামা (সন্তু)-কে নিয়ে এই মধ্যবিত্ত পরিবারটি ১৯৬০ সালের আগে অর্থাৎ কাপ্তাই লেক বানানোর জন্য করালগ্রাসের থাবার আগে বেশ স্বচ্ছল ছিল। চিত্ত কিশোর চাকমা ও সুভাষিনী দেওয়ানের পরিবার পানছড়িতে বসতি স্থাপন করেন ঠিকই কিন্তু তাদের মনপ্রাণ পড়ে থাকে রাঙ্গামাটির মহাপুরুম গ্রামে। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে মোকাবেলা করে তারা সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলেন। ১৯৬৬ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মময় জীবন শুরু করেন। দুই বছর পর ১৯৬৮ সনে তিনি চট্টগ্রামে চলে যান এবং সেখানকার একটি প্রাইভেট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় এই বিদ্যালয়টির প্রসার ঘটে। এম এন লারমার আকর্ষণীয় পাঠদান পদ্ধতির কারণে তিনি ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। যে কোন কঠিন বিষয়কে তিনি সহজ ও প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে পারতেন। শুধু তাই নয় শিক্ষকতার জীবনে তিনি ছাত্র সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেতেন। শিক্ষকতা পেশায় থাকা অবস্থায় ১৯৬৮ সালে তিনি বিএড পাশ করেন এবং ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশ করে আইন পেশা গ্রহণ করেন। তার আগে ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে মেট্রিক, চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয় হতে ১৯৬০ সালে আইএ পাশ করেন। এই কলেজে বিএ অধ্যয়নরত অবস্থায় রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে পাকিস্তান সরকার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩-তে গ্রেফতার করে। প্রায় ২ বৎসর কারাবাসের পর ৮ মার্চ ১৯৬৫ সালে শর্ত সাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ওই বছরই তিনি বিএ পাশ করেন। চট্টগ্রাম বারে

যোগদানের পর তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মামলার আইনজীবি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসব মামলার মধ্যে ১৯৭৪ সালে চারু বিকাশ চাকমা সরকারের হাতে গ্রেফতার হলে আইনজীবি হিসেবে এম এন লারমা দক্ষতা ও মহানুভবতার পরিচয় দেন।

আইন পেশায় যোগদানের ২ বছরের মধ্যেই ১৯৭০ সালে পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল হতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীসহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই আসন থেকে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সনে গণ পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকারী প্রতিনিধি হয়ে লন্ডন যান। এটা তার প্রথম ইউরোপ যাত্রা।

১৯৭৩ সনের ৭ মার্চের নির্বাচনে জয়লাভের পর জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সে ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে দাবী তোলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল ১৯৭১ সালে বাঙালী জাতির অস্তিত্বের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিল যে আওয়ামী লীগ তারা জুম্ম জনগণের শোষণ-বঞ্চনার মর্ম উপলব্দি করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা পুরোপুরি তো নয়ই আংশিকও বাস্তবায়ন ঘটেনি। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধান থেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয় এবং সংবিধানে লেখা হয় বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙালী নামে পরিচিত হবে। আজীবন সংগ্রামী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তুলে ধরেন বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে জুম্ম জনগণের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের কথা। সংবিধানের বৈষম্যমুলক ও অমানবিক অধ্যায় সম্পর্কে সংযত ও দৃপ্ত কণ্ঠে এম এন লারমা তার ভাষণে বললেন - 'একজন বাঙালী কোনদিন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপ একজন চাকমাও বাঙালী হতে পারেনা। .....বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই, আমি বাঙালী। আমার সদস্য/সদস্যা ভাইবোনদের কাছে আমার আবেদন - আমি জানি না, আজ আমাদেরই এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালী বলে পরিচিত করতে চায়। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালী জাতি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায় তাহলে এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব বিলোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালী বলে নয়.....।' মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই ভাষণের পর প্রতিবাদে শুধু সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেননি সংবিধানের এই সংশোধনীতে স্বাক্ষরও করেননি। সেদিন যদি তাঁর এই ভাষণের মর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী সাংসদদের উপলব্দিতে আসতো তাহলে ইতিহাস ভিন্ন রকম হতো। ভাষণ দিয়েই তিনি দায়িত্ব শেষ করেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। এ বৈঠকে স্বায়ত্তশাসনের দাবী পুনরায় উত্থাপন করলে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যুত্তরে এম এন লারমাসহ ডেপুটেশনের সদস্যগণ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, লারমা তুমি কি মনে কর? তোমরা আছ ৫/৬ লাখ। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। চুপচাপ করে থাক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো না। (হাতের তুড়ি মেরে মেরে তিনি বলতে লাগলেন)। প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১০ লাখ বাঙালী অনুপ্রবেশ করে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো। (সুত্রঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম, হিমাদ্রী উদয়ন চাকমা, পৃষ্ঠা-৪)। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ রকম হতাশাব্যঞ্জক উক্তির পর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সব পথ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন ভারাক্রান্ত, মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত এম এন লারমা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবতে লাগলেন। সেই ভাবনা থেকে জন্ম নিল জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে পিপলস লিবারেশন আর্মী। পাহাড়ী জনগণের প্রদত্ত নাম শান্তিবাহিনী। এর পাশাপাশি তিনি গড়ে তুললেন গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি ও মিলিশিয়া বাহিনী। অর্থাৎ জুম্ম নারী-পুরুষকে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করলেন। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট-এর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আত্মগোপন করেন এবং তখন থেকেই সরাসরি আন্দোলনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন।

১৯৫৬ থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। এ বছর প্রথম জুম্ম ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৭ সনে পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলনে তিনি বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করেন। ১৯৬০ থেকে এম এন লারমা পাহাড়ী ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। ১৯৬২ সালে যে ঐতিহাসিক পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার মূল নেতৃত্বে ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সহকর্মীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে যাবেন। কিন্তু উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সুকৌশলে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদ নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন শুরু করে। জুম্ম জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭৭ সনে জনসংহতি সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেশ কদিন ধরে। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে জনসংহতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে শান্তিবাহিনী ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল মুক্তি বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠে। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাহস,

কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য, মনোবল ও সামরিক দক্ষতা একদিকে যেমন বাংলাদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করলো অপরদিকে দেশে-বিদেশে এ বাহিনীর বীরত্বের কথা, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রামের কথা প্রচার হতে লাগলো।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮২ সনের ২০ সেপ্টেম্বর জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন শুরু হলো। একটি উপদলীয় চক্রান্তকারী সমিতির নীতি ও কৌশল তথা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপস্থাপন করে এবং সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। এই চক্রান্তকারীরা দ্রুত নিষ্পত্তির মতো অবাস্তব ও সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত করে রাতারাতি দেশ উদ্ধারের নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৮২ সনের জাতীয় সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনে তৃতীয়বারের মত এম এন লারমা সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও চক্রান্তকারীরা গোপন বৈঠক করে জনসংহতি সমিতির সমান্তরাল 'জাতীয় গণ পরিষদ' নামে একটি দল গঠনের অপচেষ্টা চালায়। চক্রান্তকারীরা জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে যখন অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরাতে থাকে তখন ১৪ জুন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অনুগত বাহিনীর সঙ্গে চক্রান্তকারীদের উস্কানীতে এক সংঘর্ষ বাধে। এভাবে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দৃঢ়তা, ধৈর্য, সাহস, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতায় এই গৃহযুদ্ধ অবসানের ব্যবস্থা হলেও চক্রান্তকারীরা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ প্রয়াসে পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করে। অন্তর্দলীয় বা গৃহযুদ্ধ শুরু হতে যাবে এ সময় এম এন লারমা চক্রান্তকারীদেরকে পার্টির সভাপতি হিসাবে পুনরায় বৈঠকে ডাকলেন। এই বৈঠকে জুম্ম জনগণের পরীক্ষিত নেতা এম এন লারমা চক্রান্তকারীদের ক্ষমা ঘোষণা করলেন। কিন্তু চক্রান্তকারীরা জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক গুপ্তচর ও দালালদের উস্কানীতে ১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। চক্রান্তকারীদের নেতা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র অতর্কিতে সশস্ত্র আক্রমণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে জুম্ম জনগণের মুক্তির অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। তাঁকে হত্যা করার পর গৃহযুদ্ধ এক মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। সেদিন চক্রান্তকারীরা শুধু এম এন লারমাকে হত্যা করেনি তাঁর অগ্রজ শুভেন্দু প্রভাস লারমা (বুলু)-কেও একই সঙ্গে হত্যা করে। অগ্রজ এই সহোদরের মৃত্যুর পর সমস্ত দায়িত্ব কনিষ্ঠ ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) উপর বর্তায়। শুধু এম এন লারমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে নয় পার্টিতে তাঁর উপর আস্থা এবং প্রজ্ঞা, মেধা, ধৈর্যশীলতা, সততা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে (সন্তু) এই দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে। প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চক্রান্তকারীদের হাত থেকে জনসংহতি সমিতিকে রক্ষা করতে এবং পার্টির দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ডাক নাম মঞ্জু। বাংলা অভিধানে মঞ্জুর শাব্দিক অর্থ সুন্দর। তার নামের মতই তিনি জুম্ম জনগণের জন্য একটি সুন্দর, শোষণহীন, স্বচ্ছল, সমাজ প্রত্যাশা করেছিলেন। সেই প্রত্যাশা থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম। কিন্তু চক্রান্তকারীরা দেশী-বিদেশী চক্রের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সেই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আগেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করে। তিনি অমর। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি বেঁচে আছেন জুম্ম জনগণের মধ্যে, মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে।

ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ - এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না

- এম এন লারমা

১০ নভেম্বর ঃ একটি সংগ্রামী স্মৃতি

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

১০ নভেম্বর জুম্ম জাতির মর্মান্তিক শোক দিবস। এই দিনে জুম্ম জাতির স্বাধীকার ও রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের জনক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং তাঁর আট জন বিশ্বস্থ সহযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের আত্মঘাতী স্কোয়াডের অস্ত্রে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন।

এই তারিখটি ঘিরে আমি বরাবরই স্মৃতির সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মর্মবেদনা ও অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। পাশাপাশি আশংকিত হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, জুম্ম জাতির স্বাধীকার অর্জনের সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিয়ে, জুম্ম জাতিকে ধরা থেকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে কি জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে এবং ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর রাতের অন্ধকারে জুম্ম জাতির সংগ্রামী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা ছিল সেই হীন ষড়যন্ত্রেরই একটি অধ্যায়।

জুম্ম জাতিকে ধরা থেকে বিলুপ্ত করার যে ষড়যন্ত্রের কথা বলা হল তা স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য অতীত ইতিহাসের কয়েকটা লাইন তুলে ধরা সমীচিন মনে করছি। ইতিহাসের এই নির্মম সত্যগুলি কারো অজানা নহে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় অধিবাসীদের ৯৭% শতাংশ আদিবাসী পাহাড়ী ছিল। আদিবাসী পাহাড়ী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্যায়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণ ইহা মেনে নেয়নি এবং কোনদিন মেনে নিতে পারেনি। কয়েকজন বিশিষ্ট পাহাড়ী নেতা ইহার তীব্র বিরোধীতা করে ভারত ও বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার) চলে যান। স্বৈরাচারী পাকিস্তান আমলে শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ী জনগণকে এক রকম অবাঞ্ছিত মনে করত এবং বরাবরই বৈষম্যমূলক আচরণ ও হয়রানি করা এবং কৌশলে তাদেরকে বিতাড়ন করতে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশে শিল্পোন্নয়নের কথা বলে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাইয়ে ১৯৬০ সালে বাঁধ দিয়ে ৫৫০০০ একর প্রথম শ্রেণীর চাষী জমিসহ ৪০০ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী জলমগ্ন করা হয়। ইহাতে এক লক্ষেরও অধিক অধিবাসী বাস্তুহারা হয়ে দারুণ দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়ে পড়ে। এর ফলে এবং বিভিন্ন কারণে প্রায় ষাট হাজার লোক, যাদের অধিকাংশই চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভারতে ও বর্মায় দেশান্তরী হতে বাধ্য হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন নেতা এই (কাপ্তাই বাঁধ) প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা আন্দোলন করেছিলেন বলে জানা নেই। অথচ বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন ছাত্রাবস্থাতেই কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলির সময় ১৯৬২ সালে তিনি চট্টগ্রামে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এই আজীবন সংগ্রামী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনের মাধ্যমে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৬৬ সালের ছয়দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে প্রবল উত্থান ঘটে তার ঢামঢোলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এদেশের জনগণের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়। তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে গিয়ে জুম্ম জনগণকে স্বাধীকার ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আসন হতে সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান বাংলাদেশের গণ পরিষদে উত্থাপিত হয়। সেই সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত দশ ভাষাভাষি এগারটি জাতিগোষ্ঠীর কথা কোথাও উল্লেখ না থাকায়, গণ পরিষদ সদস্যরূপে এই মানবদরদী নেতা গণ পরিষদে জোরালো ও আবেগপূর্ণ ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি এলাকা ঘোষণাসহ সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে সকল সুযোগ-সুবিধা দানের দাবী উত্থাপন করেন। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার উপজাতিদের উপর, নির্যাতন চালালেও ১৯৫৬ সালে ও ১৯৬২ সালে প্রণীত পাকিস্তান সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি এলাকা বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উত্থাপিত দাবী সম্পর্কে সংবিধানে ইতিবাচক কোন কার্যক্রম গৃহীত না হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পরবর্তীকালে পাহাড়ীদের দাবী পুরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সে কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ

লারমা বাকশালে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বুঝতে পারলেন, প্রকাশ্য আন্দোলনের মাধ্যমে পাহাড়ীদের দাবী আদায় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি আত্মগোপন করে গোপন ঘাঁটিতে চলে যান এবং সেখান থেকে পাহাড়ীদের স্বাধীকার আন্দোলন চালাতে থাকেন। এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল গোপনে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ এবং প্রকাশ্যে জুম্মজনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবীকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট ব্যাপক প্রচার করা ও তাদের সহানুভূতি আদায় করা। জনসংহতি সমিতি এই আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিতে থাকে। তখনই পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার সৈন্য নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে শত শত সেনাক্যাম্প গড়ে তোলে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ভরে ওঠে। পাহাড়ীদের চলাফেরা এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে গেল। এতেও তৃপ্ত না হয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯-৮০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক লক্ষ দরিদ্র বাঙালীকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে, ছলে বলে কৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনয়ন করে জুম্মদের গ্রামের পাশে, জুম্মদের জমিতে অভিবাসিত করল। যার ফলে সেই সকল গ্রাম বা অঞ্চলে জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। জুম্মদের শস্য-শ্যামল মাঠ, সবুজ পাহাড়, স্রোতস্বিনী ঝিরীত উপত্যকা এবং বসতিপূর্ণ গ্রামগুলো অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। সেই যুদ্ধে শত শত জুম্ম নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ এবং যুবক হতাহত হল। জুম্ম নারীরা হল ধর্ষিত আর অপহৃত। দলে দলে, হাজারে হাজারে জুম্ম পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এইভাবে জুম্মদের ন্যায়সঙ্গত দাবী এবং আন্দোলন ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। এমনকি জাতিসংঘেও জুম্ম জাতির স্বাধিকার লাভের এ আন্দোলন প্রভাব ফেলে।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু দিবসে আমাদের অধিকতর সচেতন ও সজাগ থাকার প্রেরণা লাভ করতে হবে। জুম্ম জাতিকে বিলুপ্ত করার জন্য বিশেষ মহল বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বনায়নের নামে, উন্নয়নের নামে, সেনানিবাস/সেনাক্যাম্প নির্মাণের নামে এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে জুম্মদের ভূমি বেদখল ও অধিগ্রহণ করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই সব ষড়যন্ত্র আপোষহীনভাবে রুখতে হবে। আসুন আমরা আমাদের মহান সংগ্রামী নেতার আপোষহীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জুম্ম জাতিকে একটি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত জাতি রূপে গড়ে তুলি। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অমর হোন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চলের একটি উপজাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হইবে

- এম এন লারমা

বাঁশী কেন আর বাজে না?

অমিয় প্রসাদ চাকমা

ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে বাঁশী নিঃসন্দেহে এক অনন্য উপাদান। বাঁশীর সুর চর্চা করে বাংলাদেশের বহু শিল্পী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান রেখে যেমনি নিজের নাম কুড়িয়ে ছিলেন তেমনি দেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে সমুন্নত রেখে মানুষের মনোরঞ্জন করেন, আনন্দ দেন এখনও। প্রত্যেক শিল্পী তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তাঁর যন্ত্রপাতি ও উপাদান নাড়াচাড়া করেন। নিখাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য শিল্পী বাদ্যযন্ত্র বাজনা করেন না, সে সাথে নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মধ্যে নিজের দর্শনকেও ফুটিয়ে তোলেন। ঠিক তেমনিই প্রয়াত মহান নেতা পরম শ্রদ্ধেয় আমার শিক্ষাগুরু এম এন লারমাও বাঁশী বাজাতেন। বাঁশী বাজিয়ে তিনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে তাঁর শৈল্পিক নিপূনতা দেখাতে পারতেন, সাথে সাথে মানুষের মনোরঞ্জনও করতেন। তিনি শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশকে ভালবাসতেন, এ জুম্ম জাতিকে গভীর ভালবাসা দিয়ে ভালবাসতেন তা নয়, বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষকেও ভালবাসতেন।

মহান নেতা জুম্ম জাতিকে গভীরভাবে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন তাঁর কথায় ও কাজে যেমনি প্রতিফলিত ও পরিলক্ষিত হতো তেমনি তাঁর বাঁশীর সুরেও তাঁর জীবন-দর্শন প্রকাশ পেতো। বাংলা স্বরলিপি বাঁশীতে তিনি যেভাবে সা-সা-নী-রে-সা, সা-নী-সা-নী, নী-সা-নী-সা, নী-রে-সা বাজাতেন, যেন কোন কণ্ঠশিল্পী সুমধুর সুরে বাস্তব কণ্ঠে গাইতেছিলেন। তখনকার সময়ে দীঘিনালা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তিনি যে শুধু ছাত্র ছাত্রীদের মনে আনন্দ দিতেন তা নয়, সাধারণ মানুষের মনেও সাড়া জাগাতেন। বাঁশীতে তিনি রবীন্দ্র সংগীতের সুরই বেশী বাজাতেন এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন সহকর্মী শিক্ষক বন্ধুদের সাথে ও সমন্বয়ে। তাঁকে সব সময় সাহায্য করতেন তখনকার সময়ের এক বুড়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক গান ও হারমোনিয়ামে পারদর্শী স্বর্গীয় শ্রী সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া।

আমি যখন অষ্টম-নবম শ্রেণীতে পড়ি তৎকালীন দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তর-পূর্বে কোণায় হেডমাষ্টার মহোদয়ের যে বাসা (ঘর) ছিল, সে সঙ্গে অন্য আর একটা ঘরও ছিল - যেখানে অন্যান্য সহকারী শিক্ষক মহোদয়গণ থাকতেন। এর ঠিক দক্ষিণ দিকে মাঠের মাঝামাঝি পুর্বে দিকে যে ছাত্রাবাসটি ছিল সেখানে অনেক সময় আমি ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার পর প্রয়াত মহান নেতা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু এম এন লারমা ঘুমানোর আগে গভীর রাতে বাঁশী বাজাতেন। আমরা ছাত্র-বন্ধুরাও গল্প-গুজব করার পর তা মন দিয়ে শুনে থাকতাম। স্বরলিপি, গান ও বিভিন্ন প্রকার সুর বাজানোর পর সবশেষে বাঁশীতে বাজাতেন স্বনামধন্য কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সেই গান টু

> ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
> তাহার মাঝে আছে দেশ এক - সকল দেশের সেরা,
> ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে - স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
> এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি-
> সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি-
> সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।

বাঁশীতে এ গানটি বাজানোর পর তাঁর মনে ও বুকে কি যেন এক অব্যক্ত বেদনা ধরফর করতো এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর বাঁশীটি 'ঘংগরং' শব্দে টেবিলের উপর ফেলে রাখতেন। হয়তঃ তখনকার সময়ের জুম্ম জাতি তথা বিশ্ব আর্তমানবতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করে বুকের অসহ্য যন্ত্রনায় ভালভাবে ঘুমাতেও পারতেন না। পরদিন ঘুম থেকে উঠে মাঠে পায়চারী করতে অথবা মাঠ পার হয়ে স্কুলের দিকে কোন প্রয়োজনে গেলেও আপন মনে কি যেন নিজে নিজেও হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতেন। আমরা অস্পষ্ট সুরে তা অনুমান করতাম দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহ বিবেচনা করে।

কিন্তু.....কিন্তু সে বাঁশীতো আর বাজে না। কেউ তাঁর মতই মধুর সুরে অমৃতময় বাঁশী আর বাজাতে পারবেনা। কেউ বাঁশী বাজালেও তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে দার্শনিক ভাব-গাম্ভীর্য্যের সুরে আর বাজাতে পারবেন না। মনে পড়ে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী প্রচারনায় সুবলং যক্ষা বাজার জুরছড়ি এলাকার জনৈক শ্রী লাড়েই চন্দ্র চাকমার বাঁশীর সুর শুনে খুশী হয়ে নিজের সঙ্গে নেয়া বাঁশীটি উপহার দিয়ে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ঐ ব্যক্তির সাথে দেখা হলে এ তিনি তথ্য দেন এবং বেঞ্জু বাজিয়ে শোনান। বর্তমানে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে ধর্ম্মপথে ধ্যানমগ্ন আছেন।

এমুহুর্তে যদি কেউ বাঁশী বাজায়, আমার মস্তিষ্ক ও মনের অন্তঃস্থলে সেই তেত্রিশ বৎসরের আগের কথা ও দিনগুলো

স্মরণে আসে এবং শ্রদ্ধেয় স্যারকে স্মরণ করে নীরবে অশ্রুসজল হই। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ও অমর কণ্ঠশিল্পী লতা মুঙ্গেশকরের কণ্ঠের গানের ভাষায় বলতে হয়-

ও বাঁশী --- কেন গায়, আমারে কাঁদায়,
সে গেছে হারায়ে- -
স্মরণের বেদনায়- -
কেন মনে এনে দেয়---
হ্যাঁ আঁ- আঁ- আঁ---
বাঁশী কেন গায়.....?

মহান নেতা এম এন লারমা আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। সে বাঁশী তো আর তিনি আমাদের মাঝে বাজিয়ে শোনাতে আসবেন না। কোন ছাত্র-ছাত্রী বা জুম্ম জাতির কোন সাধারণ মানুষকে এমনকি বিশ্বের মানুষের বিশ্বপ্রেমিক হয়ে বাঁশী বাজাতে আসবেন না, কারোর মনোরঞ্জন করে আনন্দ দিতে আসবেন না। কিন্তু আজো শুনি আমি সে বাঁশীর সুর এবং কেউ না শুনলেও চিরদিন বাজবে আমার অন্তরে সেই হৃদয়াপ্লুত দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও বিপ্লবের সুর।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না

- এম এন লারমা

প্রয়াত নেতা এম এন লারমা স্মরণে স্তুতি গীতি

বিজয় গিরি গেংগুলী

ওগো কর্ণধার,
এম এন লারমা তোমায় নমস্কার,
আমরা তোমার ত্যাগের মহিমাতে
পেলাম দিশা পথ চলার,
এম এন লারমা তোমায় নমস্কার।।

জীবন তো নয় ফুল বিছানা
লড়াই জীবনের এক নাম
বাঁচতে হলে লড়তে হবে
তোমাতে দীক্ষা পেলাম
আমরা তোমার মন্ত্রে উজ্জীবিত
আমাদের কে রুখবে আর।।

তুমি হাসি মুখে প্রাণ দিয়েছো
জাতিরে করিতে ত্রাণ
ভয়কে মোরা জয় করে আজ
রেখেছি সেই ত্যাগের মান
হে বীর আমরা তোমার সূর্য সেনা
তুমি যে সিপাহশালার।।

মোদের মুক্তি মোদের শক্তি
তোমার আত্মবলিদান
জুম্ম জাতি ত্রাণ পেয়ে আজ
গাইছে তোমার জয়গান
তুমি স্বর্গ হতে হে সারথী
লও শুভেচ্ছা জনতার।
এম এন লারমা তোমায় নমস্কার।
ওগো কর্ণধার,
এম এন লারমা তোমায় নমস্কার।।

১০ই নভেম্বর ও আজকের প্রত্যাশা

ধীর কুমার চাকমা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের মতো একটি নাম। এই নামের সাথে জড়িয়ে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি জাতিসত্তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কথা। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তার অভ্যুদয় আর মহাপ্রয়াণ। অধিকার-বঞ্চিত জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তন হবার গুণের সমন্বয় ছাড়া এরকম একটা পশ্চাৎপদ জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া যায়না। সেদিন 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া নীতি'র ভিত্তিতে চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের সাথে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ প্রচেষ্টার সফলতা নিশ্চিত - এই বিশ্বাসে তিনি ৯ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে অসুস্থ শরীরে শুয়েছিলেন। আস্তানার চারি পাশের ঝোপঝাড়ে, গাছের-বাঁশের পাতায় টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিলো। মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া। চারিদিকে ঘন কালো অন্ধকার রাত। পরদিন ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ সালের রাত ভোর হলো। বনের পশুপাখী জেগে উঠলো। কিন্তু যার ডাকে সাড়া দিয়ে অধিকার বঞ্চিত জুম্ম জাতি জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে সামিল হয়েছিল সে নেতা এম এন লারমার ঘুম ভাঙলো না। বিভেদপন্থীদের কারবাইনের বুলেটের আঘাতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আজ ১০ নভেম্বর ২০০০ সাল তাঁর ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু অধিকার বঞ্চিত লাখো জুম্ম জনতা ও স্থায়ী পার্বত্যবাসী তাদের চেতনার অগ্রদূতকে আজো ভুলেনি। তাই প্রতিবারের মতো এবারও এম এন লারমা ও তাঁর সঙ্গে শহীদ হওয়া আটজন বীর যোদ্ধাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

যে জাতি অধিকার নিয়ে কোনদিন ভাবতে পারেনি, ভাবার সুযোগও পায়নি সে জাতিকে তিনি তা দেখিয়ে গেছেন। নিঃস্ব জুম্ম জনতা অর্জন করেছে প্রতিবাদের ভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বিশ্বের মেহনতি মানুষের জন্য এম এন লারমার সেটাই বড় অবদান। সেদিন বিভেদপন্থীদের শত ছলনার মাঝেও জুম্ম জনগণ বিভ্রান্ত হয়নি। ক্ষণজন্মা এই অবিসংবাদিত নেতার মৃত্যুতে পৃথিবীর মানুষ হতবাক হয়েছে। কিন্তু জুম্ম জনগণ মোটেও নিরাশ হয়নি। তাই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য নেতার প্রদর্শিত পথে চলতে তারা ছিলেন সদা প্রস্তুত। তার অবর্তমানে পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটেছে। এরই মাঝে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে। জুম্ম জনতাকে এ চুক্তি দেখিয়েছে অনেক আশার আলো। কিন্তু সেই ৮৩ সালের চার কুচক্রী ও বিভেদপন্থীদের দোসর হয়ে সুবিধাবাদী একটি মহল চুক্তি বিরোধীতা শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘোলাজলে মাছ ধরার জন্য জুম্মদের মাঝে পুনঃ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর সেটা হল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা ও নেতৃত্বকে ধ্বংস করা।

সেদিন শত সহস্র গোলাবারুদ নিয়ে জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে নির্লজ্জের মতো সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল দ্রুত নিষ্পত্তিবাদী বিভেদপন্থীরা। তাদের মতো করুণ পরিণতি যাতে আজকের চুক্তি বিরোধীদের না ঘটে অতীত থেকে সে শিক্ষা নেয়া উচিত। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধীতা মানে অবিমৃশ্যকারীতা। এ কাজ করা সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিকোচিত কাজ নয়। ৮৩ সালে বৃষ্টি ভেজা কালো রাতের অন্ধকারে নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র যেমনি জুম্ম জনগণ মেনে নিতে পারেনি তেমনি গ্রহণ করতে পারেনি আজকের চুক্তি বিরোধী ধারাকে। এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত অচিরেই বন্ধ করে চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা শান্তিকামী মানুষের একান্ত প্রত্যাশা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তথা সকল স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়েই চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। সেটাই এবারের ১০ নভেম্বর ২০০০ এর আহ্বান মনে করা বাঞ্ছনীয়।

আজকে সম্পাদিত চুক্তি আর অতীতে পেশকৃত দাবীর মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। বাস্তবতার নিরিখে ইতিপূর্বে পেশকৃত মুল দাবীর ক্রম পর্যায়রূপ হচ্ছে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন হলো আন্দোলনের চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি। তাতে কারোর দ্বিধা সংশয় থাকা উচিত নয়। মুলতঃ অতীতের দাবীর ভিত্তিতেই চুক্তির সূত্রপাত।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সাংসদ হিসেবে এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ তুলে ধরেন ঃ-

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩। উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ছাড়া এ অঞ্চলের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী বা পরিবর্তন যেন না হয় এইরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

এই চারদফা দাবীনামা সম্বলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তার ফলেই গড়ে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলন। অপর পক্ষে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারিভিযানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) ওয়াদা ছিল যে, তিনি ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান দিবেন। জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ আওয়ামী লীগের এই ওয়াদার উপর বিশ্বাস রেখেছিল। ফলে রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংলাপ অব্যাহত থাকে। ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমেই সংলাপ পরিণতি লাভ করে এবং একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষা কবচ। অন্যথায় ৭২ সালের দাবী প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো ছাড়া জুম্ম জনগণের বিকল্প আর কোন পথ থাকবে না।

১৯৭৫ সালে এম এন লারমা সরাসরি সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদানের পর সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। তার পরবর্তীতে ১৭ই সেপ্টেম্বর বর্তমান নেতা সন্তু লারমা অসুস্থাবস্থায় বাংলাদেশ পুলিশের হাতে (পানছড়ি থানাধীন কুকি ছড়া নামক স্থানে) ধৃত হওয়ার ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক সরকার আসে আর যায়। কিন্তু পার্বত্য চট্ট গ্রামের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন সরকারই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রত্যেকটি সরকার সামরিকভাবে সমাধানের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। অপরপক্ষে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হওয়াতে সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার করার উপর পার্টি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়। ইত্যবসরে বর্তমান নেতা সন্তু লারমার দীর্ঘ কারাবাস মুহূর্তে চিহ্নিত করতে পারলেও বিভেদপন্থীদের বাদ দিয়ে আন্দোলনে এম এন লারমার সহযোগী হিসেবে কাজ করার মতো অনেকেই ছিল। কিন্তু এম এন লারমার 'কাউকে বাদ দিয়ে এ আন্দোলন নয়' - এই যুক্তিতে বিভেদপন্থীদের কাউকেই বাদ দেওয়া যায়নি। এই সুযোগে চার কুচক্রী বিভেদপন্থীরা ঘোলাজলে মাছ ধরতে গিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অবৈধভাবে দখল করতে চেয়েছিল। আসলে বিভেদপন্থীরা একদিকে ছিল শ্রমবিমুখ অন্যদিকে কেন্দ্রীয় নির্দেশ পালনে তারা ছিল অক্ষম ও সন্দিগ্ধ। তাই অনায়াসে বসে বসে আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ, পলায়নবাদ, রক্ষনশীলতাবাদ ও হঠকারীতাবাদ তাদের আষ্টেপৃষ্টে পেয়ে বসেছিল। সব সময় এই সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এম এন লারমাকে সহযোগিতার নামে দূর্বল করার তালেই ছিল। পার্টির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কাজে সফলতার দাবীদার হতো চক্ররা আর বিফলতার জন্য দায়ী করা হতো এম এন লারমার নেতৃত্বকে। এসব কিছুর মূলেই ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা। মূলতঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার মতো যোগ্যতা তাদের কারোর ছিল না। সে সময় এম এন লারমার পাশে থেকে তাকে সহযোগিতার জন্য সর্বক্ষণ যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সদস্য অনাদি রঞ্জন চাকমা (অম্বর)। ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হতে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী (সন্তু লারমার কারামুক্তি) পর্যন্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র ছিল ঝঞ্জা-বহুল। এসময় অতিশ্রমজনিত কারণে অনাদি রঞ্জন (শহীদ অম্বর) এবং এম এন লারমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরও কাজ থেমে থাকেনি।

১৯৮০-৮১ সাল বাংলাদেশ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা সন্তু লারমা কারামুক্তি লাভ করলেন ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে। অপরপক্ষে বাংলাদেশের তখনকার রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ৩১শে মে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান। তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানের পালা। এহেন মুহূর্তে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে নুতন সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠে। একদিকে এম এন লারমার গুরুতর অসুস্থতা অন্যদিকে সন্তু লারমার পুনঃ দলের নেতৃত্ব গ্রহণে বিভেদপন্থীদের অখুশীভাব। এসব কিছু সত্ত্বেও বিভেদপন্থীরা পার্টির মূল নেতৃত্বকে ম্লান করে দিতে পারেনি। ফলতঃ হতাশ হয়ে হঠকারীতার পথ বেছে নিতে বাধ্য হলো। ১৯৮২ সালের শেষে জাতীয় মহাসম্মেলনে পার্টির কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। তাতেও তাদের শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে তাদের অনুগামীদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের অনুমতি দিয়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র অনাকাংখিত গৃহযুদ্ধের কলংক নিয়ে বিদেশে নিরাপদ জীবন যাপনে ব্যাপৃত আছেন। এভাবে ১৯৮৩ সালে সূচিত অনাকাংখিত গৃহযুদ্ধাবসান ঘটলো আত্মসমর্পণের মতো করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে।

১৯৮৫ সালে এপ্রিলে বিভেদপন্থীদের (সরকারের কাছে) আত্মসমর্পণের পর জুন মাসে সাধারণ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্তু লারমার সুযোগ্য নেতৃত্বে মূল পার্টির অভ্যন্তরে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এভাবে সংগঠনের এক পর্যায়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী গমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতীতে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তিকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক

সংঘাত ছিলনা। তারা সাম্প্রদায়িক সম্ভাব বজায় রেখে বসবাস করতো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর হতে এই সম্পর্কের ভাঙন ধরে ১৯৭১ সালে কিছু উচ্ছৃঙ্খল মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পানছড়িতে গণহত্যা, ১৯৮১ সালে অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক কলমপতি-ইছামতি গণহত্যা, ১৯৮৪ সালে ভূষনছড়া গণহত্যা, ১৯৮৬ সালে ফেনী, দীঘিনালা ও পানছড়ি থানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, ১৯৮৯ সালে লংগদু গণহত্যা ইত্যাদি ঐতিহাসিক হত্যাকান্ড পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী বাঙালী সম্পর্কে চির ধরে। উপরন্তু ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে সমতল থেকে আগত অউপজাতীয়রা ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি তথা ভূমি আইন লংঘন করে। ফলে স্থায়ী বাসিন্দাদের (উপজাতি-অউপজাতি) ভূমি একচেটিয়া দখল করার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত লাগে চরমভাবে। আর পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় সশস্ত্র আন্দোলন। ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর চুক্তির মাধ্যমেই সশস্ত্র আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। তার পরবর্তী কথা আর কারোর অজানা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক জেএসএস সদস্যদের পুনর্বাসন, আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন, স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সেনা শাসন প্রত্যাহার ও অস্থায়ী সেনা শিবির সরিয়ে নেওয়া, ভূমি কমিশন গঠন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন ইত্যাদি কোনটায় সুসম্পন্ন হয়নি। একদিকে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অসদিচ্ছা অপরদিকে দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, চিংকিউ রোয়াজা চেয়ারম্যান ও কল্পরঞ্জন মন্ত্রী এদের অসহযোগিতামূলক আচরণে জুম্ম জনগণ বিস্মিত ও হতাশ না হয়ে পারেনি। সুবিধাবাদী মহলের ছত্রছায়ায় কতিপয় চুক্তি বিরোধী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের নামে সর্বত্র সন্ত্রাসী রাজত্ব স্থান বিশেষে জেএসএস সদস্যদের জিম্মি করে রেখেছে। তাছাড়াও উন্নয়ন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টিসহ চাঁদাবাজি ও অপহরণ কাজ অব্যাহত রেখেছে। একই সঙ্গে জেএসএস এর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য জেএসএস এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। এসবই হচ্ছে ১৯৮৩ সালে অনাকাংখিত গৃহযুদ্ধে পরাজিত বিভেদপন্থীদের কার্যকলাপ। তাদের কার্যকলাপকে সুবিধাবাদী মহল নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করছেন।

(১) কোন কোন সময় অনুপ্রবেশকারীদের উপর অহেতুকভাবে (শারিরীক, অর্থনৈতিক) আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা।

(২) উত্তেজিত অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনার জন্য জেএসএস এর উপর দোষ চাপানো, কেননা জেএসএস অনুপ্রবেশকারীদের অন্যত্র বিরোধহীন স্থানে তাদের সরিয়ে নিতে পারেনি।

(৩) অস্ত্রবাজী করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অশান্ত বলে প্রমাণ করা যাতে করে সেনাশাসন বলবৎ রাখা সহজ হয়।

(৪) জুম্মদের মধ্যে জেএসএস বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে জুম্ম দিয়ে জুম্ম হত্যাকান্ড ঘটানো ও পরিস্থিতি ঘোলাটে করা।

(৫) অতীতে সশস্ত্র আন্দোলন হতে ঝরে যাওয়া (প্রাক্তন) জেএসএস সদস্যদের জেএসএস এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। এবং

(৬) আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ দিয়ে অনুপ্রবেশকারী অ-উপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদানসহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বর্তমান অবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।

আমরা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অনেককে হারিয়েছিলাম। তাদের কাউকে আমরা ফেরৎ পাবোনা। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব তাদের মহান ত্যাগের মহিমাকে সার্থক করে তোলা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করেই আন্দোলন শেষ হয়নি। তাতে আন্দোলনের কৌশল পাল্টেছে মাত্র। এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম করে গেছেন। আর সকল মানুষের স্বার্থ সেবা করতে গিয়েই তিনি শহীদ হলেন। চুক্তি বাস্তবায়ন হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটবে। আজকের এই ১০ নভেম্বর ২০০০ উদযাপনকালে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাইবোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই

- এম এন লারমা

শোক না চেতনা

তনয় দেওয়ান

১৭ বছর আগের ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জুম্ম জাতির মধ্যে যে অত্যন্ত মর্মান্তিক, ভয়াবহ, শোকে মুহ্যমান ঘটনাটি ঘটেছিল আসলে সেটা কি? হত্যাকান্ড; পার্টি ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র; আন্দোলন নস্যাৎ নাকি ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ? এগুলোর কোনটাই মিথ্যে নয়। সবগুলোর পেছনে রয়েছে চরম সত্য।

গৃহযুদ্ধটা বড়ই মর্মান্তিক আকার ধারণ করেছিল। যেমন পার্টির অভ্যন্তরে সশস্ত্র সদস্যদের মধ্যে তেমনি সমগ্র জনগণ ও আন্দোলনের উপর। একই ক্যাম্পে দীর্ঘদিন ধরে মুক্তির অপেক্ষায় দিনগোণা সহযোদ্ধা গুলি চালিয়েছে একে অন্যের উপর, ভাই হত্যা করেছে ভাইকে। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে তিল তিল করে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠা সংগঠন গেছে ভেঙে, ম্লান করে দিয়েছে ভবিষ্যৎ অর্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে। দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল পার্টি আর তার প্রভাবে জনগণ। মাঝখানে আস্ফালন করেছিল শত্রুরা। সেদিনটির আগেও একজন সহযোদ্ধা ভুল করেও ভাবতে পারেনি পাশে রাইফেল বুকে ঘুমিয়ে থাকা সহযোদ্ধাকে গুলি করতে পারবে। ১০ই নভেম্বর সে অকল্পনীয় দিনগুলোর সূচনা করেছিল। ক্ষমতার মোহকে চরিতার্থ করতে গিয়ে গিরি-প্রকাশ-পলাশ-দেবেন এর কয়েক কেজি মগজের দুষ্টু বুদ্ধিতে হারাতে হলো শত সহস্র বর্ষের উজ্জ্বল নক্ষত্র, জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, অবিসংবাদিত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। গৃহযুদ্ধের ফলে শহীদ হওয়া সহযোদ্ধার সংখ্যা আরো অনেক। কিন্তু শোকের তীব্রতা অপরিমেয়।

শত্রুর ষড়যন্ত্র সেদিন সফল হয়েছিল সত্য। এম এন লারমা তখন আর আমাদের মাঝে নেই। বাত্যা গ্রুপ (চার কুচক্রী- গিরি- প্রকাশ-দেবেন পলাশ গ্রুপ) নাম দিয়ে পার্টির অপর একটি কুচক্রী সৃষ্টি হলো। পার্টির দু'টি অংশের উভয়ের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শুরু হলো আর এক অনাকাংখিত বিয়োগান্তক সংগ্রাম। যে সংগ্রামে ছিল শুধুই হারানোর ব্যথা। চক্ররা যে গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়েছে বা লেজ গুটিয়েছে সেটা তাদের শুভ বুদ্ধির জন্য নয়, বাধ্য হয়ে। এম এন লারমার শাহাদাৎ বরণের পর পর গোটা কর্মী বাহিনী জুড়ে জমে থাকা ষড়যন্ত্রের কুয়াশা দ্রুত মুছে যায় আর নেতা যখন প্রাণ দিয়েছে আমরা কেন পারবো না - এ প্রত্যয়ে অকুতোভয়ে লড়েছে আদর্শবান প্রগতিশীল সহযোদ্ধারা। গোটা জনগণের কাছে তখন চক্রদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। তাদের মৃত্যু ঘন্টা বাজানোর আর কোন দরকার ছিল না। কেননা ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রের থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। জনগণই নিজেদের অস্তিত্বের যুদ্ধ মনে করে চার কুচক্রীদের পরাজিত করতে সক্রিয় হয়ে উঠে। '৮৩ সালের গৃহযুদ্ধ অবসানে জনগণই ছিল প্রধান শক্তি। বিপ্লবী সশস্ত্র সহযোদ্ধারা সেটাকে বাস্তবে রূপদান করেছে মাত্র। জনগণের সমর্থন আর সক্রিয়তার কারণে বিপ্লবী শক্তি শত প্রতিকূলতার মাঝেও জয়যুক্ত হতে পেরেছিল। এই পরিস্থিতিতে চক্রদের পাহাড়ের জঙ্গলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার আর উপায় ছিল না।

গোটা বিশ্বের দৃষ্টি তখন এ গৃহযুদ্ধের দিকে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এর ব্যাপ্তি ছিল সুদুরপ্রসারী। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপ্লবী শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অধিকারকামী পার্টিতেও একই প্রভাব পড়বে। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদেরকেও ছাড়বে না। বাংলাদেশের সাথে যারা রাজনৈতিক দর কষাকষি করে স্বার্থোদ্ধার করে তাদের বাজারও মার খাবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না - এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য। যাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে যেভাবে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল স্নায়ুযুদ্ধের যুগে আর যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্র গড়ে না উঠে। গৃহযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে সমগ্র জুম্ম জনতাকে সশস্ত্র হতে বাধ্য হতে হবে। বিপ্লবী শক্তি যদি কোন মতে ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ায় তবে তাতে বিপ্লবী শক্তি অদম্য হয়ে উঠবে। ফলে কি সর্বনাশ হবে সেটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা, শত্রুরা ভালো করে জানতো। ক্ষমতালিপ্সুরা আত্মসমর্পণ করে তখন লেজ গুটিয়ে নেবে। শত্রুর এ ভয়টিও ছিল। তাই তারা গৃহযুদ্ধ লম্বা করতে আর মদদ দেয়নি চার কুচক্রীদের। ফলে চক্ররা একে একে আত্মসমর্পণের নামে শত্রুদের শিবিরে ফিরে গেল জাতীয় জীবনে দুর্যোগের আকাশ রেখে।

খুব ভালো হতো যদি নতুন রূপে এধরণের গৃহযুদ্ধ জুম্ম জাতির বুকে আর না হতো। মন্দের ভালো হতো যদি কেহ গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করতো। কিন্তু রাজনীতির পেছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়নি। যার কারণে নতুন ধংএ আবার গৃহযুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে।

তাহলে কি বলতে হবে যে '৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের বিয়োগান্তক শোকাবহ দিনের অবসান হয়নি? অবসান হয়নি

শত্রুদের ষড়যন্ত্রের চাল? উত্তর হতে পারে হ্যাঁ অথবা না। কেননা দুটোই সত্য হতে পারে যদি বিপ্লবী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি বলি যে, গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র পরাজিত হয়েছে, তবে বলতে হবে গৃহযুদ্ধ শেষ বা অবসান হয়েছে। আবার যদি বলি তাদের প্রেতাত্মারা প্রসিত-সঞ্জয় এর নামে নতুন করে গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তবে বলতে হবে গৃহযুদ্ধ মোটেই শেষ হয়নি। কেননা বিভেদের খড়গ, সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে। যার কারণে চেহারা আর নামের পরিবর্তন ঘটলেও '৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের গৃহযুদ্ধের দিনগুলি আর '৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরের পর চুক্তিত্তোর বর্তমান দিনগুলি মাত্রায় তারতম্য হলেও চরিত্রে এক ও অভিন্ন। মোট কথা পার্টি এবং জনগণ এখনো গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়নি।

বলা হয় দ্বি-মতাদর্শগত তত্ত্বের ভিত্তিতে পার্টিতে ভাঙন ধরেছিল। একদিকে দ্রুত অধিকার আদায়ের নাম ভাঙিয়ে বাত্যা গ্রুপ আর অপরদিকে তাদের ভাষায় দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের নামে লাম্বা গ্রুপ। আসলে বিষয়টা কি?

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৯ মাসের যুদ্ধে। আমরা অস্ত্র ধরেছি ৯ বছর হলো। কিন্তু কেন কাংখিত মুক্তি আসছে না? সব দোষ নেতৃত্বের - এ মুখরোচক সস্তা শ্লোগান আর রাজনৈতিক কুটচাল তুলে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই-এর নামে চার কুচক্রীরা পার্টিতে ষড়যন্ত্রের বীজ থেকে গৃহযুদ্ধের মহীরুহ বানিয়েছিল। কিন্তু তাদের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই-এর তত্ত্ব ১০ নভেম্বরের বৃষ্টি ভেজা ঘন কালো রাত্রিতে দিবালোকের মতো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ১১ নভেম্বরে জানাজানি হয়ে গেল এম এন লারমাকে হত্যা করা হয়েছে, মুহূর্তে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল পার্টি। আসলে ভাগটা আরো অনেক আগে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল চক্রদের লোলুপ মনে। নেতৃত্বে ভুল থাকতে পারে তবে তার সমাধান তাকে হত্যা করে নয়। আসলে চক্ররা কখনো পার্টির মূল চালিকাশক্তি ছিল না। পার্টির সমস্যা কি, সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতা কি, লড়াই-এর পদ্ধতি কি প্রভৃতি বিষয়ে তারা ভাসাভাসা জ্ঞান রাখতো মাত্র এবং সামগ্রিক চিন্তাধারা তাদের ছিল না বলে তারা না ছিল দায়িত্বশীল, না ছিল দুরদর্শী। ফলে আভ্যন্তরীণভাবে তাদের মধ্যেও ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস আর সন্দেহ। তারা না ছিল আদর্শবান, না ছিল সাহসী। তাদের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই-এর যে সর্বশেষ পরিণতি শত্রু শিবিরে আশ্রয় নেয়া সেটা পার্টি নেতৃত্ব জানতো। আর জানতো বলেই পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের দীক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাদের অপকর্মগুলোকে সহ্য করেছিল, জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রেখে মুক্তির লড়াইকে জোরদার করতে।

জুম্মদের মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার আদায় করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী লড়াই-এর জন্য তাদের উপযুক্ত হতে হবে। মার্কিন-সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধের যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে কোন জাতির জাতীয় মুক্তির জন্য এটা ছিল সবচেয়ে বাস্তবভিত্তিক কৌশল-পদ্ধতি। এটা পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে স্বচ্ছভাবে জানা ছিল। সেজন্য তারা দীর্ঘমেয়াদী লড়াই-উপযোগী কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে থাকে। নেতৃত্ব জানতো যে, মাথা গরম করে, মুহূর্তের আবেগে বিস্ফোরিত হলে জুম্ম জাতির অধিকার আনা যাবে না। যেমনি একটা মশালের আলোর চেয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি অনেক ব্যাপক কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র এবং ব্যবহার অনুপযোগী। আর মশালটি থেকে শত সহস্র মশাল জ্বালানো যায়। সৃষ্টি করা যায় দাবানলের। তারা জানতো যে, শত্রু শক্তিশালী তবে তারা অন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা একদিন রণক্লান্ত হতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেদিনটি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যেদিন পর্যন্ত না শত্রুরা লেজ গুটিয়ে নিচ্ছে। আর সেজন্য চাই মানবতার আদর্শ। যাতে একজন জুম্ম সামন্তবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে। কারণ লড়াই মানুষ করে না; লড়াই করে মানুষের ভিতরের যে ন্যায়বোধ ও প্রগতিশীল আদর্শ থাকে সেটাই। আর এটাই চূড়ান্ত অর্থে লড়াই চালিয়ে যায়। আর লড়াইটা বিজাতীয় সম্প্রসারণবাদী ও মৌলবাদী আগ্রাসী শাসকের বিরুদ্ধে হলেও তাদের মোড়ল হলো সাম্রাজ্যবাদ। তাই চূড়ান্ত অর্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে যদি বিজয় ছিনিয়ে আনতে চাই। এভাবে সুগভীর দুরদর্শিতা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই এর মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন এম এন লারমা।

আন্তর্জাতিক একটা ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়েই যে এম এন লারমাকে হত্যা করা হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রদের বক্তব্যেই তার প্রমাণ মিলে। তাদের বক্তব্য ছিল - বিদেশীরা আমাদের সাহায্য করতে একপায়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধুমাত্র আমাদের পার্টি নেতৃত্ব সঠিক নয় বলে তারা সহযোগিতা দিচ্ছে না। আর আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না। যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতঃ ষড়যন্ত্রের কতকগুলো কথা বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ সাহায্যের শর্ত হিসেবে নেতৃত্বে পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নেতৃত্ব দখলের প্ররোচণা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী মহলের প্রয়োজন ছিল পার্টির ভেতরে লুকিয়ে থাকা উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রের আর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের দরকার ছিল নেতৃত্ব দখলের জন্য একটা পৃষ্টপোষকতা এবং সেটি জনগণ বা পার্টি কর্মীবাহিনী নয় বরং সাম্রাজ্যবাদীদের। এই যে তারা উভয়ে পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধ হলো তাতে বিভেদের খড়গ দু'ভাগ করলো পার্টিকে, জনগণকে। এটা ১০ নভেম্বরের পেছনে একটা শর্ত, অন্যতম শর্ত।

জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের বদলে গৃহযুদ্ধ হলো। তার ভিত্তিটা কি তাহলে? সহজভাবে ভিত্তি আর শর্ত কথা দু'টি একে অন্যের

পরিপূরক। একটা না হলে অন্যটা বিকশিত হতে পারে না। তবে ভিত্তিটি হলো মুখ্য আর শর্তটি হলো গৌণ। ভিত্তিটা ছিল পার্টির অভ্যন্তরে। কিভাবে? আসল কারণ বেশ গভীর। পার্টিতে অনেকেই যোগ দিয়েছেন। নানা জাতির, নানা পেশার, ছাত্র বয়সের আর শ্রেণীর। সাধারণভাবে লক্ষ্য সবারই এক - শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আর সেজন্য সবাই মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে পার্টিতে যোগদান করেছিল। কিন্তু সকলের চিন্তাধারা এক ছিল না এবং ফাটলটা সেখানেই। যেখান দিয়ে ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্প পার্টিতে ঢুকেছিল। কেহ কেহ ছিল নিছক জাতীয়তাবাদী, কেহ কেহ ছিল সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া রক্ত টগবগের তরুণ, কেহ কেহ পার্টিকে আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পার্টির প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শবোধ গ্রহণে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সবাই পালন করতে সমর্থ হতো না। ফলে পার্টির সামগ্রিক চিন্তাধারার সাথে কর্মীদের ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাধারা সমন্বয়ের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এই চিন্তাধারার অমিলই বৈরী সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

জুম্ম সমাজে সামন্তীয় শাসন-শোষণ, উপনিবেশিক আগ্রাসন প্রভৃতির ফলে সমাজের পরিমন্ডলে সৃষ্টি করেছে এক নষ্ট সমাজের ধুম্রজাল। সমাজের সাংস্কৃতিক মননে অগণতান্ত্রিক মনোভাব, প্রতিশোধ পরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা আর তার সাথে কতিপয় শিক্ষিতের উচ্চাভিলাষ, হীন স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিপ্সুতা প্রভৃতির ককটেলে পরিণত জুম্ম সমাজ হতে প্রকৃত কর্মী বাছাইয়ের নামে পার্টিতে রুদ্ধদ্বারবাদী চিন্তাধারা না রেখে সর্বস্তরের জনতাকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য এম এন লারমার বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় সদা জাগ্রত ছিল। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব আর পশ্চাদপদ সমাজের পিছুটানের আপোষকামীতার কথা জেনেও তিনি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে সামগ্রিক বাস্তবতাবোধে অবগত কর্মীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন সর্বদা। আর কর্মীরা যেহেতু এধরণের সমাজেরই প্রতিনিধি তাই তিনি শত্রুর ক্যাম্প সম্প্রসারণবাদী সামরিক নীতি ও সংখ্যালঘুতে পরিণত করার নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী লড়াই আর আদর্শবান কর্মীবাহিনীর প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। কিন্তু চক্ররা একথাগুলো কখনই কর্ণপাত করত না এবং প্রতিটি মুহূর্তে কেবলি নেতৃত্বের ভুল খোঁজা আর কর্মীদের মনে অসহিষ্ণুতার কথা প্রকাশ করত। আর সেটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিলো যখন মহামারী আকারে এ সকল ক্ষয়রোগ পার্টিতে ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে চক্ররা ক্ষুদে সার্কেলের স্বার্থকে তথাকথিত তাত্ত্বিক মানে দাড় করিয়ে তথাকথিত সুরতন রাজ্যের নাম ভাঙিয়ে কর্মীদেরকে সশস্ত্র সংঘাতে ব্যবহার করতে পেরেছে। আর কর্মীদের ঘোর কেটে যায় মহান নেতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

ইতিহাসের নতুন পৃষ্ঠায় বিকশিত, প্রতিষ্ঠিত জাতির আসনে অলংকৃত করতে, সংগ্রামের আরো বৃহত্তর রূপ সৃষ্টি করতে পার্টি জনগণের মত নিয়ে সরকারের সাথে একটি চুক্তি করে। জনগণের ভাষায় যে চুক্তির নাম দেয়া হয় শান্তিচুক্তি। সরকারের লক্ষ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন। তার জন্য কিছু ছাড় দিয়ে সশস্ত্র সংঘাত নিরসন করা। আর পার্টির লক্ষ্য এর মধ্য দিয়ে সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তন করে চূড়ান্ত বিজয়ের পথ উন্মোচিত করা। এ অবস্থায় দুটি বৈরী শক্তির ভারসাম্য অবস্থায় চুক্তিটি সম্পাদিত হতে পেরেছিল। তাই চুক্তিটি একটা অবস্থা, অবস্থান নয়। এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে নতুন ধংএর গৃহযুদ্ধের শুরু। প্রথমে বিবৃতি, তারপরে জনসভা। আস্তে আস্তে ইট-পাটকেল, পাল্টা মিছিল এবং পরিশেষে সশস্ত্রভাবে। তাদের বক্তব্য একটা - পার্টি পানির দরে জুম্ম জাতিকে বিক্রি করছে। তাই জাতোদ্ধার করতে হবে, রুখতে হবে জনসংহতি সমিতিকে।

প্রথমে লাশ পড়লো সাধারণ জনগণের যারা চুক্তি বিরোধীদের বক্তব্যে বিশ্বাস করেনি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত ছাত্র-যুবকদের। সবশেষে সরাসরি জনসংহতি সমিতির সদস্যদের। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের সাথে তাদের এখানে সুন্দর একটি মিল রয়েছে। চক্ররা বলতো নেতৃত্বের কারণে অধিকার আসছে না আর গুন্ডুষরা বলছে - পার্টি অধিকার জলাঞ্জলি দিচ্ছে। কথা দু'টির বৈপরীত্য থাকলেও উৎস কিন্তু এক। আর তা হলো অধিকার। অধিকার নামক লোভনীয় শব্দটিই উভয়ে বেছে নিয়েছিল।

নেতৃত্ব নিয়ে উভয়েরই অসন্তোষ লক্ষ্যনীয়। গুন্ডুষ নেতৃত্ব বলতো - জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব বুড়ো হয়ে গেছে, তাদের হাঁটু দুর্বল হয়ে পড়েছে, তারা আর লড়াই করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানেও নেতৃত্বের প্রশ্ন। চক্ররা চেয়েছিল নেতৃত্ব দখল করতে আর গুন্ডুষরা চেয়েছিল নেতৃত্ব পচিয়ে দিতে। এক্ষেত্রে প্রসিত-সঞ্চয়ের একটা সুবিধা বা অসুবিধা ছিল। আর তা হলো তারা ছিল পার্টির বাইরে। তাই যেহেতু পার্টিতে নেতৃত্ব দখল করা যাবে না, তাই তার বিকল্প পার্টি তৈরী করতে হবে। আর তাই তারা প্রচার করতে লাগলো - জনসংহতি সমিতি একটা ভাঙা নৌকো, সেটা দিয়ে জুম্ম জাতি দুর্যোগের সাগর পাড়ি দিতে পারবে না। দরকার একটি নতুন বলিষ্ঠ সংগঠন। এজন্য তারা প্রথমে 'জুম্ম ন্যাশনাল ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট' নামে একটা পার্টি খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হওয়া কর্মীবাহিনী বাঁধ সাধে। ফলে তারা প্রথম পদক্ষেপেই ধাক্কা খায় যেভাবে ১৯৭৭ সালের জাতীয় মহাসম্মেলনে চক্ররা বাঁধাগ্রস্থ হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমক্র্যাটিক ফ্রন্ট' নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলে তাদের পকেট ভাড়াটে কর্মীদের দিয়ে। এরা এখন এর মাধ্যমে পার্টির সাথে দর কষাকষি করতে চায়। তাদের ভাষায় রাজনৈতিক স্বীকৃতি চায়। বক্তব্যে, বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়। তাদের কাছে প্রশ্ন - বিভেদ করে আপনারাই তো পার্টি আর আন্দোলনে বিভক্তি রেখা টানলেন। এখন কেন ঐক্যের শ্লোগান তুলে মায়াকান্না দেখাচ্ছেন? মূলতঃ তারা চক্রদের মতো ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা

করা নীতির মতো সুযোগ নেবার জন্য ঐক্য চাই, ঐক্য চাই বলে রাখাল বালকটির মতো বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে বলে চিৎকারের সামিল করছে মাত্র। যেন মোক্ষম সুযোগ পেলে পার্টিকে ল্যাং মেরে দেশপ্রেমিক সাজতে পারে।

আলাদা একটা দল করলেই আর সে দলের নেতা হলেই দেশপ্রেমিক বা অধিকারকামী হওয়া যায় না। কারণ দলটি সৃষ্টির প্রেক্ষাপট আর তাদের কর্মসূচীই তার পরিচয় তুলে ধরে। গুন্ডুষ দলের এতদিনকার কর্মকান্ড লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের প্রধান কাজ হলো জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করা। সেজন্য প্রয়োজনে হত্যা, অপহরণ প্রভৃতি ঘৃণ্য পথ বেছে নেয়া। এ পর্যন্ত তারা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বললেও এবং রোমান্টিক বিপ্লবী সেজে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ সহ সেনাবাহিনীর উপর একবারও আক্রমণ করেনি বরং তাদের সাথে দহরম মহরম করে আসছে।

চক্ররা যেভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের শ্লোগান তুলেছিল তেমনি গুন্ডুষরা তুলছে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের শ্লোগান। তাদের কৌশলটিও এখানে এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ লোক ভোলানো একটি যাদুমন্ত্রের আশ্রয় নেয়া। দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইটি যেমনি ছিল নীতি-কৌশলের দিক দিয়ে ভ্রান্ত তেমনি এটিও বাস্তবতা-বিবর্জিত। সময়ের তালে একটা মানুষের, একটা জাতির এমনকি একটা রাষ্ট্রের চাওয়া পাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। আর এই চাওয়াটা বা দাবীটা হলো আপেক্ষিক অর্থাৎ এটা ধ্রুব নয়। জুম্ম জাতির অস্তিত্বের জন্যও অধিকারের ধারণাটি আপেক্ষিক। একটা সময় ছিল যখন জুম্মরা এক হাতের লাঠিওয়ালা পুলিশ দেখলে ভয়ে জ্ঞান হারাতো। শান্তিবাহিনীর যুগে তো জুম্মরা ভয়ে পালায়নি বরং আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত আর্মীদেরকে এ্যাম্বুশ করে যুদ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে জুম্মরা এর চাইতে আরো এগিয়ে যাবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি নির্মাণ করে যাচ্ছি তাদের জন্য। তাদের যদি পায়ের তলায় মাটি না থাকে তবে তারা দাঁড়াবে কোথায়? তাই তাদের জন্য চাই নিরাপদ, স্থিতিশীল ভূমি অধিকার। যেখান থেকে তারা সুন্দর আগামীর জন্য লড়বে।

গৃহযুদ্ধের সময়ে দেখা গেছে চক্ররা মুখোমুখি হলে দু'একটা গুলী চালিয়ে পালিয়ে যেতো আর আর্মীরা এসে তখন শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। অর্থাৎ চক্ররা প্রকারান্তরে আর্মীদের অগ্রসর ছত্রীসেনা হয়ে 'বি' টিমের ভূমিকা পালন করতো। আর এখন গুন্ডুষরা? তাদের বেলায়ও একই রূপ। তারা চাচ্ছে যে কোন উপায়ে জনসংহতি সমিতিকে নতুন করে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করাতে। আগে শত্রুরা অস্ত্রধারণে বাধ্য করায় তারা নিজেরাই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে পার্টি ও জনগণের উপর সামরিক নিপীড়ন চালিয়েছে। এখন আর্মীরা চুক্তির কারণে সরাসরি সামরিক চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না। আর তাদের হয়ে কাজটি করছে গুন্ডুষ চক্র। যেন জনসংহতি সমিতির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। এর ফলে সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ তুঙ্গে উঠলে আর্মীরা বলবে এখানে যুদ্ধাবস্থা তাই তাদেরকে প্রত্যাহার করা যাবে না। তাদের প্রত্যাহার না হলে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তিও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ ঘোলা হয়ে উঠবে। ঘোলা হলে সেনাবাহিনীর লাভ, গুন্ডুষ চক্রদের লাভ।

অন্ধকার রয়েছে বলে আমরা আলোর অস্তিত্বকে অনুভব করি। চুক্তিরও রয়েছে পক্ষ আর বিপক্ষ। রয়েছে আরো প্রতিপক্ষ। আন্দোলনের বেলাতেও এরূপ দুইধারা। একটি প্রগতির অন্যটি প্রতিক্রিয়াশীলতার। একটা করতে চায় সৃষ্টি অন্যটা চায় সেটাকে বাধাগ্রস্থ করতে। প্রতিক্রিয়াশীলরা কখনো কখনো প্রতিবিপ্লবী। জুম্ম জনগণের যে ধারাটি প্রগতির তা যুগে যুগে ঐক্যবদ্ধ এবং লৌহদৃঢ়। আর যে ধারাটি প্রতিক্রিয়াশীল তা ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থের ভাবাবেগে বিভক্ত। এরা সংগ্রাম বিমুখ সুবিধাবাদী, দালাল আর লেজুরদের দলে। *এরা কখনো অতিশয় সংগ্রামী, জনবিচ্ছিন্ন।* ক্ষুদ্র এবং হীন স্বার্থ সম্পন্ন গোষ্ঠীতে ঐক্যবদ্ধ। এ ধারাটিই প্রতিবিপ্লবী। চুক্তি নিয়ে সশস্ত্র বিরোধীতায় তৎপর প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের ধারাটি প্রতিবিপ্লবের ধারা। এদের ধর্ম হলো যা কিছু সমস্ত অর্জিত হয়েছে সেটা ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া। গণতান্ত্রিকতার মুখোশ পড়ে, সংগ্রামের চর্ম গায়ে জড়িয়ে বিপ্লবের বারোটা বাজানো এদের প্রধান কাজ। জনতা তাদের কাছে পরীক্ষাগারের গিনিপিগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল-এজেন্ট বদরুদ্দীন-আনু মুহাম্মদই তাদের শক্তির উৎস, চেতনা দাতা। অতীতটা জনগণ দেখেছে। এখন তা আবার ঘটুক সেটা জনগণ মনে প্রাণে চায় না। বর্তমানটা তাই তাদের কাছে নষ্ট অতীতের উপসংহার বৈ কিছুই নয়। এটা তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

সময় ক্ষমা করেনি কাউকে। না আন্দোলন, না পার্টিকে। যার কারণে ইতিহাসের সময়ের গতিতে যথাযথভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি জুম্ম সমাজ। তাই চক্ররা শুধু এম এন লারমাকে হত্যা করেনি, তারা কেড়ে নিয়েছে মুক্তির সোনালী সূর্যের ভবিষ্যতকে, ফেলে দিয়েছে ইতিহাসের পেছনের চাকায়। বিভেদ অতীতেও ছিল এখনো আছে। অতীতটা ব্যাখ্যা করা বর্তমানে সহজ কিন্তু ভবিষ্যতটা? প্রশ্ন হলো কে কার পক্ষ নেবে? কোন সত্য আর সংগ্রামকে আমরা প্রতিষ্ঠা করবো - বিভেদের নাকি ঐক্যের? অধিকারের নাকি গোলামীর? আমরা যদি ঐক্যের পক্ষে হই, অধিকারের পক্ষে হই তবে শুধু ১০ নভেম্বর মহান নেতার শোক দিবস তথা জাতীয় শোক দিবস পালন নয়, উপড়ে ফেলতে হবে সমাজের সামন্ত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাকে., পরিবর্তন আনতে হবে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে, নিশ্চিহ্ন করতে হবে বিদ্যমান বিভেদমুলক সকল অপশক্তিকে। তবেই শোকের ইতিহাস পরিণত হবে শক্তি আর অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবময় ইতিহাসে।

গৃহযুদ্ধ

পূণ্য বিকাশ চাকমা কীটো

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে - ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এ সমাজ ব্যবস্থার কারণে সমগ্র জুম্ম জনগণের মধ্যে মাত্রাগতভাবে সুবিধাবাদী, পরনির্ভরশীল ও আপোষপন্থী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে সমাজের অবস্থান থেকে জনসংহতি সমিতিতে যোগদানের প্রাক্কালে এসব প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাসমূহ তাদের সঙ্গে করে পরোক্ষে অনুপ্রবেশ করেছে। আর তার সাথে সহযোগী হিসেবে রয়েছে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থপরতা ও ক্ষমতালিপ্সার মনোবৃত্তি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে রয়েছে প্রগতিশীল চিন্তাধারা। তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের নির্মম অত্যাচার উৎপীড়নের তাড়নায় প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাদ্বয় জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এবং সরকারের দমন পীড়নের তাড়নায় দুই বিপরীতমুখী হলেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল। ক্রমে বাংলাদেশ সরকারের দমন পীড়নের মাত্রা হ্রাস পেলে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা মাথা সাড়া দিয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদের দালাল চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ-এর নেতৃত্বে।

সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা সুবিধাবাদী হবার কারণে অন্যের পিছনে পিছনে গিয়ে লভ্যাংশ পেতে চায় এবং কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে চায় না। ফলে এ চিন্তাধারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। পরনির্ভরশীল হবার কারণে সব সময় অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকে। আপোষপন্থী হবার কারণে সংগ্রাম বিমুখ হয়ে যে কোন সময় যে কোন অশুভ শক্তির সাথে আপোষ করতে দ্বিধা করে না এবং প্রতিক্রিয়াশীল হবার কারণে অন্যের ভাল যেমনি দেখতে পারে না তেমনি কাউকে ক্ষমাও করতে পারে না। তাই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা কোন অবস্থাতেই এবং কোন কালেই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাঙালী ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। অপরদিকে পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও বর্তমান জনসংহতি সমিতির সভাপতি অবিসংবাদিত নেতা শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতিশীল চিন্তাধারা সংগ্রামী, ত্যাগী, আপোষহীন এবং আত্মনির্ভরশীল বিধায় জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ চিন্তাধারা আত্মনির্ভরশীলতার জন্য কারোর করুণার উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বগতিতে আন্দোলন সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম। এ চিন্তাধারা ত্যাগী আত্মনির্ভরশীল ও সংগ্রামশীলতার কারণে কোন কালে কোন অবস্থাতেই কোন অশুভ শক্তির নিকট আপোষ করেনি। বরং আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে শূণ্য থেকে জন্ম দিয়ে আজ ফুলে ফলে ভরে তুলতে সক্ষম হয়েছে - দু' সংগ্রামী জননেতার কঠোর পরিশ্রমে। মূলতঃ একদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারা অপরদিকে সামন্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুই চিন্তাধারার নীতি-আদর্শগত ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই 'গৃহযুদ্ধে'র জন্ম দেয়।

ক্ষমতালিপ্সু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীরা জনসংহতি সমিতির ১৯৭৭ সালের জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কাছ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব জোর করে কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। যার ফলে শান্তিবাহিনীর তদানীন্তন সুচতুর ফিল্ড কমান্ডার এবং বর্তমান জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমাকে ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ষড়যন্ত্রের ফলে সরকারের নিকট ধৃত হয়ে কারাভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া না নেয়া বিষয়ে তুমুল বাকবিতন্ডা শুরু হয় খুব সংগোপনে। সে সময়ে ক্ষমতা কেড়ে না নেয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশী মত এবং যুক্তি উত্থাপিত হলে মুখোশধারণ পূর্বক চুপিসারে একসাথে কাজ করে যেতে থাকে। সে সময় ক্ষমতা কেড়ে না নেয়ার কারণগুলো হচ্ছে -

ক) আন্দোলনের কাজে তাদের দক্ষতার অভাব। তাই লারমাদের সাথে থেকে কাজ শিখে নেয়ার জন্য সুযোগ গ্রহণ করা;

খ) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তাই বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের কৌশল আয়ত্ব করা;

গ) অতি সংগোপনে কর্মীবাহিনী ও জনমত তাদের অনুকূলে আনার জন্য সময় নেয়া;

ঘ) অস্ত্রশক্তি ও অর্থশক্তি তাদের দখলে নিয়ে আসা।

উপরোক্ত শর্তগুলো ১৯৭৭ সালে পরিপূর্ণ করতে না পারার কারণে কুচক্রীরা সে সময়ে তাদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯৮২ সালের জাতীয় মহাসম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত চার কুচক্রীদের উক্ত শর্তগুলো আংশিক পূর্ণ হলে, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের স্রোত তীব্র হলে এবং শ্রদ্ধেয় সন্তু লারমা কারামুক্ত হলে চার কুচক্রীরা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, নীতি-আদর্শ বড় নাকি জাতি বড়? তাদের মতে জাতি বড়। জাতি টিকে থাকতে না পারলে নীতি-আদর্শ

টিকে থাকতে পারে না। অপরদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিশ্বাস করে যে, নীতি-আদর্শ ঠিক না থাকলে দুনিয়াতে কিছুই টিকে থাকতে পারে না। জাতি টিকে থাকতে হলে আগে নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তখন কুচক্রীরা শুরু করে দেয় গ্রুপিং-লবিং। প্রগতিশীল চিন্তাধারা কিন্তু তার আপন গতিতে চলতে থাকলো আর প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়ালো। ফলে ১৯৮২ সালের জাতীয় মহাসম্মেলনে গোপন ব্যালটে ভোট হয়। ভোটে ব্যাপক ব্যবধানে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ধারক-বাহক চার কুচক্রীর পরাজয় ঘটলো। তবুও যাতে তাদের কোন দ্বিধা-সংশয় না থাকে তজ্জন্য ক্ষমাশীল, পরমত সহিষ্ণু ও জাতীয় মহান নেতা তাঁর সমাপনী ভাষণে আহ্বান জানালেন যে, 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া' নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে, একাত্ম হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য। কারণ তিনি ক্ষমাগুণ, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তন হবার গুণ এর প্রবক্তা ও বিশ্বাসী ছিলেন। এই ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির সুযোগে চার কুচক্রীরা সংগোপনে সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়ায়। তাই ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর তারিখে রাতে হানা দেয় জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। উক্ত দিনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর ৮ জন সহযোগীসহ নির্মমভাবে শহীদ হন - অবিসংবাদিত নেতা, জাতীয় চেতনা ও জাগরণের অগ্রদূত এবং জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। সেদিন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সতর্কীকরণ সংকেত ছিল ১১ নম্বরে এবং তিনি রোগ শয্যাশায়ী ছিলেন। প্রথমাবস্থায় তাঁর পায়ে গুলিবিদ্ধ হলে তাঁর পরিচর্যাকারী পালানোর প্রস্তাব দিলেও তিনি অস্বীকৃতি জানান। তাঁকে মারতে গিয়ে পরপর কয়েকজন ব্যর্থ হয়। মারতে উদ্যত হলে স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে তিনি বলেন - 'বন্ধুরা আমাকে মেরে যদি তোমাদের জাতীয় মুক্তি বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ফিরে পাও তাহলে মারো এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যত ভালোমন্দ দেখাশুনা করিও'। একথা বললে কেহ হত্যা করতে সাহস করেনি। কিন্তু এ্যামং নামে একজন বিভেদপন্থী কোন কথা না শুনে কার্বাইন এর উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ারে শ্রদ্ধেয় নেতার বুক নৃশংসভাবে ঝাঁঝরা করে দিলে তাঁর শেষ প্রাণবায়ুর পরিসমাপ্তি ঘটে।

চার কুচক্রীরা ব্যাপক জনমত তাদের অনুকূলে নেওয়ার জন্য জনগণের নিকট এইমর্মে রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকে যে, 'সংগ্রামী জনগণ, আপনারা তাড়াতাড়ি অধিকার চান নাকি দেরীতে চান? আমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি অধিকার চাই। তাই আমরা বাধি (খাটো)। কিন্তু লারমারা দেরীতে চায়। তাই তারা লাম্বা (দীর্ঘ)। লারমারা বিদেশের সাহায্য নিতে চায় না। বিদেশীরা আমাদের সাহায্য করতে চায়। আমরা বিদেশের সাহায্যে তিন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনতা আনবো। যেমনটি করে ৯ মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে'। এরপর থেকে দু' গ্রুপের নাম যথাক্রমে 'লাম্বা' ও 'বাধি' হয় এবং এ গৃহযুদ্ধ 'লাম্বা-বাধি যুদ্ধ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

জনগণ স্বভাবতই তাড়াতাড়িতে অধিকার কামনা করে। তাই তাদের সস্তা শ্লোগানে কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম পরিহাস! সেই মিথ্যা বুলি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। যখন ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তাঁর ৮ জন সহযোগীসহ কেন্দ্রীয় কার্যালয় আক্রমণ করে নির্মমভাবে হত্যা করলো তখন জনগণের কাছে তাদের হীন মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল। কারণ সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা হল - একজন গৃহস্থ ব্যক্তি কুকুর লালন পালন করে তার উপকারের জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কুকুরের জলাতঙ্ক রোগে ধরলেও সে মনিবকে চেনে এবং কামড়ায় না। কিন্তু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এ চার কুচক্রী এম এন লারমার ভাত-নুন খেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পয়সায় লেখাপড়া শিখে এবং পার্টিতে তাঁর চেষ্টায় গড়ে উঠে তাঁকে যদি ক্ষমতার লিপ্সায় নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে তাহলে এসব অকৃতজ্ঞ ও মিথ্যাবাদীদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে? বরঞ্চ দেশ ও জাতিকে নিয়ে চিনিমিনি খেলা খেলবে ও বেচাকেনা করবে। কারণ তাদের কাছে কুকুরের কান্ডজ্ঞানটুকুও নেই। এভাবে তারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে কুড়াল বসিয়ে আন্দোলনকে পঙ্গু করার অপচেষ্টা শুরু করে। শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। ব্যাপক জনগণের বিরোধীতার কারণে প্রতিটি লড়াইয়ে পিছু হটা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। কোথাও টিকে থাকার মতো অবস্থা না পেয়ে প্রাণের মায়ায় তারা তদানীন্তন এরশাদ সরকারের কাছে নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। এভাবেই তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে তলিয়ে গেল। তবুও সময় সুযোগ পেলে তাদের মাথাছাড়া দিয়ে উঠার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির গৃহযুদ্ধের ফলে জুম্ম জনগণের অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আমরা হারিয়েছি অনেক বাবা-ভাই ও সংগ্রামী সহযোদ্ধা। সর্বোপরি হারিয়েছি মেহনতি ও অত্যাচারিত মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও আপামর জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় অবিসংবাদিত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তার আটজন সহযোগীসহ। একদিকে এ অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, জুম্ম জণগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে কোন চিন্তাধারা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এবং বাস্তবোচিত। একমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারাই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আর কোন চিন্তাধারাই পারে না। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েছেন। আন্দোলনের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলেও জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধেয় মহান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা, তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কঠিন কঠোর পরিশ্রমে দ্রুত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মৃতঃপ্রায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছিলেন - যার ফলশ্রুতি আজকের এ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'। এ চুক্তিকে আজ প্রসিত-সঞ্চয় নেতৃত্বাধীন নব্য চক্ররা মেনে নিতে গররাজি তা ভাল কথা। কিন্তু জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থক সাধারণ জনগণকে হত্যা করা মহা অপরাধ। এ অপরাধের অনলে একদিন তাদের তিলে তিলে দগ্ধ হতে হবে হবেই। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ধোঁয়া তুলে নিরীহ জনগণকে বিভ্রান্ত করে কোন লাভ হবে না। বরঞ্চ অতীতের গৃহযুদ্ধ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি। এক গৃহযুদ্ধে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের ষড়যন্ত্রে জাতীয় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হারিয়েছি। আরো এক গৃহযুদ্ধে এ চার কুচক্রীর উত্তরসূরী প্রসিত-সঞ্চয়ের ষড়যন্ত্রে বর্তমান জাতীয় মহান নেতা পরম শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে কখনো হারাতে পারি না। অতীতের গৃহযুদ্ধে যেমনি আপামর জুম্ম জনগণের সঠিক রায়ে এবং পূর্ণ সমর্থনে জনসংহতি সমিতি জয়লাভ করেছিল। আজো তেমনি সঠিক রায় প্রদান করার উপযুক্ত সময় এসেছে সমগ্র জাতির কাছে। জনগণের রায়ের উপর নির্ভর করছে জুম্ম জাতির ভাগ্য। ১৯৮৩ সালে চার কুচক্রীদের সাথে পার্টির যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তাদের উত্তরসূরী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সাথে বর্তমান গৃহযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। শুধু নাম ও রূপের পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। তাই সর্বস্তরের জুম্ম জনগণের কাছে উদাত্ত আহ্বান - আসুন, আমরা সঠিক রায় ঘোষণা করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অশুভ শক্তিকে উৎখাত করি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার আদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করি।

তুমি

চিংহ্লামং মারমা (তপু)

পাহাড় ঠোঁটে ঝরণা যেমন
তেমনি তুমি আমার
ভোরের কাছে শিশির যেমন
তেমনি তুমি আমার
সাগর বুকের ঢেউ যেমন
তেমনি তুমি আমার
আকাশেতে চাঁদ যেমন
তেমনি তুমি আমার
চোখের কাছে দৃষ্টি যেমন,
তেমনি তুমি আমার।

যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় প্রসঙ্গে

সুদীর্ঘ চাকমা

যুগে যুগে প্রতিটি দেশেই রাজনীতিতে দুটো ধারা দেখা যায় - একটা শাসকশ্রেণীর রাজনীতি - যার উদ্দেশ্য শোষণমুলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। আরেকটা হলো - শোষণ-শাসন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় সত্য প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। যুগে যুগে শাসকশ্রেণী যখন দেখে তাদের অন্যায় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তখনই তারা নানাবিধ নির্যাতনের পাশাপাশি সমাজকে কলুষিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

যে কোন সমাজে, রাষ্ট্রে যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের, জাতির দুঃসময়ে শাসকের নিপীড়ন, অত্যাচারে মাথা উচুঁ করে রুখে দাঁড়াবার শক্তি যুব সমাজেরই রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে শত শত যুবক বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বৃটিশ শাসকের ভিত কাঁপিয়েছে। দু'শো বছরের বৃটিশ শাসকদের বিদ্যালয়ে পড়ে যে শিক্ষা ভারতবাসী পায়নি ১৮ বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম স্কুল-কলেজ ক্যারিয়ার ছেড়ে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার চেয়ে অনেক বড় শিক্ষা দেশবাসীর জন্য রেখে গিয়েছিল। ফলে শাসকেরা তাদের শোষণ-শাসন অব্যাহত রাখার স্বার্থে যুব সমাজকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি ন্যায়-নীতির শক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় তখনই তারা ছাত্র-যুব সমাজকে তাদের অনুগত সুবিধাভোগী গোলাম অথবা নিষ্ক্রিয়-নির্জীব প্রাণীতে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। শাসকগোষ্ঠী প্রচারণা চালায় লেখাপড়াই হচ্ছে ছাত্র সমাজের একমাত্র দায়িত্ব। সমাজ সম্পর্কে ভাববার অবকাশ তাদের নেই। এ সম্পর্কে নেতাজী সুভাষ বসু বলেছিলেন- ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ। এই বচনের দোহাই দিয়ে ছাত্র সমাজকে দেশ সেবার কাজ থেকে নিরস্ত্র রাখার চেষ্টা অনেকেই করে থাকেন। অধ্যয়ন কোনদিন তপস্যা হতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতগুলি পরীক্ষায় পাস। এর দ্বারা মানুষ স্বর্ণ পদক লাভ করতে পারে, হয়তো বড় চাকুরী পেতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় - মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার অবিচার বা অনাচার দেখবে সেখানে নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করে প্রতিবাদ করবে এবং নিবারনের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করবে।

স্বাধীন বাংলাদেশে যখন জুম্ম জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হলো না তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের একঝাঁক যুবক জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও তারাই পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। অসীম সাহসে, অদম্য তেজে, অতুলনীয় বীরত্বে, অপরিসীম সততা ও নিষ্ঠায়, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উজ্জ্বল চরিত্র এদের মধ্যে সেদিন প্রস্ফুটিত হয়েছিল। সেদিন তারা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ঘরে বসে থাকেনি, জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়। উন্নত চরিত্র ধারণ না করলে এটা কোনদিন সম্ভব হতো না।

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার চরিত্র। সমাজ নানা সমস্যা ও সংকটের মধ্যে জর্জরিত। কিন্তু নীতি-নৈতিকতার সংকট যখন দেখা দেয় তা সমাজে মারাত্মক আকার ধারণ করে। অত্যাচারের তাড়না যতই হোক না কেন তার দ্বারা একটা জাতিকে মেরে ফেলা যায় না। বৃটিশরা দু'শো বছরের উপর পদানত করতে পেরেছিল, কিন্তু ভারতবাসীকে মারতে পারেনি। ভিয়েতনামকে বোমা মেরে মেরে আমেরিকা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে এবং সেখানকার মানুষগুলোকে একেবারে মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গোটা জাতির মেরুদন্ডকে ভাঙতে পারেনি। একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেয়েও লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। শাসকগোষ্ঠী জুম্ম সমাজকে ধ্বংস করার জন্য সামরিক বাহিনী দিয়ে হত্যাকান্ড ঘটিয়েও শেষ করতে পারেনি বিধায় বর্তমানে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করে দেয়ার জন্য অদ্যাবধি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মানুষের মধ্যে যখন নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, বিবেক থাকে না তখন সে পশুতে দাঁড়ায়। সে কারণে যুগে যুগে শাসকেরা তাদের শাসন করার সুবিধার্থে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুব সমাজের চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সর্বক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। যাতে তারা প্রতিবাদহীন, বিবেক-মনুষ্যত্বহীন, নির্জীব প্রাণী হয়ে বেঁচে থাকে। নিপীড়িত, নির্যাতিত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করে তখন শাসকশ্রেণী তাদের টার্গেট অনুযায়ী যুব সমাজকে অধঃপতিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সমাজের, জাতির দুঃসময়ে যাতে যুব সমাজ মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে রাজনীতির বাইরে রাখার চেষ্টা করা হয়। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ যাতে রাজনীতি বিমুখ হয় সেজন্য বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োগ দিয়ে সমতল এলাকায় পোষ্টিং দেয়া হয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় ক্লাব গঠনের মধ্য দিয়ে মদ,

জুয়ার আসর বসিয়ে যুবসমাজকে আন্দোলন বিমুখ করে রাখার চেষ্টাও তৎসময়ে লক্ষ্যনীয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়।

বিশ্বব্যাপী শাসকেরা যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। এ পরিণতি আমরা সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের জনজীবনেও দেখতে পায়। সেখানে ভালোবাসার হাহাকার। পাশ্চাত্য দেশে বৃদ্ধ বাবা-মা সপ্তাহান্তে পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতনির সান্নিধ্য পেতে টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে - যারা রবিবারে পুত্র-পুত্রবধূ বা নাতি-নাতনীরূপে এসে ভালোবাসার অভিনয় করে টাকা নিয়ে যায়। আমেরিকার প্রাক্তন শিক্ষা সচিব উইলিয়াম জে বেনেট চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেছেন - ''যদিও আমরা জাগতিক সুখ ভোগ করছি কিন্তু চরিত্র নিয়ে বেঁচে নেই। গত ৩০ বছরের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে ৫৬%, পিতা-মাতা পরিত্যক্ত সন্তান বেড়েছে ৩০%.....। ৯০ সালে এক সমীক্ষায় দেখা গেল ড্রাগ খাওয়া, মদ খাওয়া, ধর্ষণ, ডাকাতি, সহিংসে হামলায় এই আমেরিকা ক্রমশঃ অবক্ষয়ের অতলে ডুবে যাচ্ছে। এটা ভেবেই আমার খুব ব্যাথা দিচ্ছে'' (Vital Speeches of the Lecture'93) । দক্ষিণ কোরিয়ার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। পাক হান নামে এক যুবক ছাত্র হিসেবে আমেরিকাতে পড়তে গিয়েছিল। সে সেখান থেকে দেশে ফিরে তার বাবাকে খুন করে এবং প্রমাণ লোপের জন্য বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাবা পাক সুঙ ছিলেন এক কোরীয় সংস্থার ম্যানেজার। এই খুনের উদ্দেশ্য হল তড়িঘড়ি বাবার সম্পত্তি দখল। সবুর সয়নি (পিয়ং ইয়ং টাইমস ২৪/৬/৯৫)। বিশ্বব্যাপী শাসকেরা যুব সমাজকে এ অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জুম্ম সমাজের মধ্যেও নিত্য নতুন অমানবিক ঘটনা ঘটে চলেছে - যা জুম্মদের সামাজিক রীতি-নীতিকে প্রতিনিয়ত আঘাত করছে। জুম্ম কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাও বর্তমানে অবাস্তব কিছুই নয়। জুলাই ২০০০ সালে রাঙামাটিতে চক্রপাড়া নামক স্থানে ৪ জন পাহাড়ী যুবক মিলে এক নববধূকে ধর্ষণ করে (পরবর্তীতে তারা চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপে যোগ দেয়)। ১৯৯৯ সালের শেষান্তে রাঙ্গামাটির রাঙাপানি এলাকায় কয়েকজন পাহাড়ী যুবক এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো অনেক জায়গায় এসব ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। পাহাড়ী যুবকেরা হেরোইন, ফেনসিডিল, মদের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকে। শহর এলাকায় ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজির ঘটনা বেড়ে চলেছে। ভিডিও দোকানসমূহে অশ্লীল ছবির ছড়াছড়ি। ৪৫টি চ্যানেল ডিশ এন্টিনায় দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশে। সেখানে অশ্লীল দৃশ্য সম্প্রচার করা হচ্ছে। প্রভাবিত হচ্ছে আমাদের যুব সমাজ। বড় বড় ধর্মীয় উৎসবেও এসব অনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্যনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেবার জন্য নকল এর উৎসব শুরু হয়েছে। প্রশাসন সচেতনভাবেই নীরব। উদ্দেশ্য যাতে পাহাড়ী ছাত্র সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। কারণ মেধাহীন মানুষের ভালো কিছুই করা সম্ভব নয়।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাময়ী এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে এখানকার (পার্বত্য চট্টগ্রাম) সমাজ-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-আচারণের উপর তারা আঘাত হানতে চায়। থাইল্যান্ডে দেখা গেছে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠার পর দিন দিন সেখানে পতিতাবৃত্তি বেড়েছে, গরীব মেয়েরা দেহ বিক্রি করে সংসার চালাতে বাধ্য হচ্ছে। মাদক ব্যবসা সেখানে জমজমাট। সেখানকার সামাজিক রীতি-নীতি দারুণভাবে সংকটগ্রস্থ। যুব সমাজ দিন দিন অধঃপতিত হচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যাতে পাহাড়ীরা প্রাণে বেঁচে থাকলেও মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে না পারে।

৭০ দশকে যে যুব সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন, যৌবন বিসর্জন দিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে, দীর্ঘ সংগ্রামের বীর গাঁথা রচনা করেছে। অন্যদিকে আমরা বর্তমানে যুব সমাজকে দেখতে পাচ্ছি হতাশাগ্রস্থ, সমাজ সম্পর্কে দায়বদ্ধতাহীন হয়ে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা ও নেশায় মাতাল হয়ে আছে। তাই এ ব্যাপারে সামাজিকভাবে প্রতিরোধের মাধ্যমে যুব সমাজের চরিত্র উন্নত করার প্রচেষ্টা করা দরকার। আর যুব সমাজের চরিত্র যদি ধ্বংস হয় তাহলে জুম্ম জাতীয় জীবনে অস্তিত্বের প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়াবে। যুব সমাজের প্রতি সুনাগরিক হওয়ার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে উপদেশ বর্ষণ করা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি - হীনস্বার্থপরতা, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি চূড়ান্ত অনীহা কিভাবে যুব সমাজের প্রাণসত্তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও সামরিক শাসনের আমলে যে যুব সমাজ দেশপ্রেমে টগবগ করত, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এগিয়ে আসত, আজ সেই যুব সমাজের মধ্যেই কোন্ নৈতিক অধঃপতনের এই কুৎসিত রূপ দেখা যাচ্ছে? আমাদের শিশুরা নিশ্চয়ই বর্তমানে জন্ম থেকে অধঃপতিত ও বিকৃত হয়ে ভূমিষ্ট হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে সামাজিক পরিবেশ, জাতিগত নিপীড়ন, শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতিগ্রস্থ ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বই যুব সমাজের অধঃপতনের মূল উৎস। সুতরাং আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মূল কারণটি অনুসন্ধান না করে যদি যুব সমাজের মধ্যকার হীনস্বার্থপরতা, নৈতিক অধঃপতন ও সমাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত অনীহা দেখে আমরা শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করি তাহলে কার্যকর কিছুই করতে পারব না। তাই অন্তর্নিহিত উৎসসমূহ দুরীকরণের জন্য সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

এম এন লারমার প্রতি খোলা চিঠি

প্রিয় মহান নেতা,

সর্বাগ্রে আমার হাজার হাজার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। শুনেছি আপনি নাকি সারাজীবন ধরে জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছেন। আরো শুনেছি জুম্ম জাতির জাতীয় স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করে বহু জুম্ম সাহসী যোদ্ধা মৃত্যু বরণ করেছেন। বিশেষতঃ জুলোবাবু, রামবাবু এরা সত্যিই সত্যিই নাকি সাহসী ছিলেন এবং সাহসের সাথে যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তারা নাকি আপনার নীতি-আদর্শের বিশ্বস্থ সৈনিক ছিলেন। তাদের মত আরো বহু নাম না জানা ভলান্টিয়ার ও কম্যান্ডার সংকাজ করে মারা গিয়েছেন তাদের সবাইকে আমার অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে সালাম জানাই। আমার উচিত তাদেরকে সংগ্রামী সালাম দেওয়া কিন্তু সংগ্রাম কি করে করতে হয় তা আজো আমি জানি না। তাই আমার ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রামী সালাম জানাবার সাহস হলো না।

শুনেছি আপনি নাকি খুবই সাহসী লোক ছিলেন। সবচাইতে বড় কথা আপনার নাকি দারুণ ভাল বুদ্ধি ছিল। আজ আমি মনে মনে ভাবি এত বড় একটা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা কখনও সহজ কাজ নয়। এখনও পর্যন্ত যা দেখি হাজার হাজার আর্মী, বিডিআর, পুলিশ, গোয়েন্দা আর আমলা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন আছে তারা সবাই আপনার বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। তাদেরকে ঠেকিয়ে আপনি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন যেই আন্দোলন দীর্ঘ তিন দশক ধরে চলছে তা আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। অথচ আপনি মারা গিয়েছেন, স্বর্গবাসী হয়েছেন কিন্তু আপনার নীতিগত সংগ্রাম আজও চলছে। মনে হচ্ছে এই আন্দোলন এখন থামবে না। আরো দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন চলতে থাকবে। জনগণের বিভিন্ন জনের মুখে শুনি এক সময় এই পার্বত্য চট্ট গ্রামে ২/৩ টা পাকা রাস্তা ব্যতীত তেমন কিছু ছিলনা; এখন দেখি বহু রাস্তাঘাটে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গাড়ীতে চড়ছে। এক সময় নাকি রাজনীতি করাও যেত না এখন কত রাজনৈতিক পার্টি, এমনও এক সময় ছিল জুম্মদের চাকরী-বাকরী দেওয়া হতো না। এখন শত শত জুম্ম চাকুরীজীবি, প্রতিদিন অফিসে যায়, কত পয়সা রোজগার করে। পাবলিকরা বলে এসব আন্দোলনের ফল, এমনকি কিছু কিছু শিক্ষিত বাঙালীদের থেকেও শোনা যায় এগুলো সবই আন্দোলনের ফল। কিন্তু আমাদের জুম্ম চাকুরীজীবিদের অনেকেই তা স্বীকার করে না। কেউ কেউ মনে করে তারা নিজেদের যোগ্যতার বলেই চাকুরী পেয়েছে। কিন্তু পরোক্ষভাবে আপনারও অবদান যে রয়েছে তা অনেকেই স্বীকার করে না। জুম্ম জনগণ এসব শিক্ষিত লোকদের ঠাট্টা তামাশা করে। সমাজে এমন লোক আছে যারা একসময় আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দালালী করেছে আজকে তারাই বেশী ভাল চাকুরী ও ভাল সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, এমনও শোনা যায় যারা আপনাকে মেরেছে তাদেরকেই সরকার সবচাইতে বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। তারা আজ আন্দোলনের বিরুদ্ধে, জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। জনগণ মনে করে তাদের সমুচিত শাস্তি হওয়া দরকার। কারণ অন্যান্য অনেক বাঙালীর মত তারাও ঘুষ খায়, নানান দুর্নীতি করে। তারা আসলে সমাজকে এক ধরণের রসাতলে ফেলে দিচ্ছে। তারা ঘুষের টাকা দিয়ে মদ খায়, ব্যাভিচারী করে। সমাজে যত অন্যায় সবই তারা করে কিন্তু সমাজে কেউ তাদের বিচার করতে পারেনা।

আমি দেখি আপনার শিষ্য অনেকেই রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ নিয়মিতভাবে করার চেষ্টা করছে। তারা বোধ হয় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মাথা ঘামায়, চিন্তা করে জনগণকে কিভাবে সুখ শান্তি দেওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক মানুষ এখনও কঠিন দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটাচ্ছে। এখন শান্তি চুক্তি হয়েছে। যুদ্ধ আর চলছে না। কিন্তু জনগণের মধ্যে অভাব অনটন সাংঘাতিক। অনেকেই দীর্ঘ শরণার্থী জীবন কাটিয়ে সহায় সম্বল সব হারিয়েছে। অনেকে আছে আর্মির অত্যাচারের ভয়ে সেটেলারদের অত্যাচারে নিজ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তারা অনেকেই এখন নিজের জায়গায় ফিরতে পারেনি। নিজের বাস্তভিটা ও জমিজমা ফেরৎ পায়নি এমন লোকের সংখ্যা অজস্র। তাই আজকাল দেখা যায় গাছ বাঁশ কেটে যারা কাট্টন করে তারা হাজারে হাজারে মাইনী রিজার্ভ ও কাচালং রিজার্ভে, শংখ-মাতামুহুরী রিজার্ভে কিছু পয়সা কামিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। আর অনেকে ঐ সমস্ত রিজার্ভে জুম চাষ করে কোন মতে দিন কাটাচ্ছে।

তাদের এই দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য আপনার লোকজন ভিতর এলাকায় খুব কম যায়। দেখা যায় আপনার কিছু কিছু কর্মী আছে তারা অত্যন্ত হতাশায় ভুগছে। অনেকে আবার অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। আমরা যতটুকু জানি আপনি নাকি অত্যন্ত সৎ মানুষ ছিলেন। কোন লোভ লালসা আপনার ছিল না। এমনকি সরকারের লোক ভোলানো কত লোভ লালসাও আপনাকে ফেরাতে পারেনি। সরকারী সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে বিনা দ্বিধায় আপনি অত্যন্ত অনিশ্চিত ও কষ্টকর জঙ্গল জীবন মেনে নিয়েছেন। জুম্ম জনগণের লাখ লাখ মানুষের মধ্যে কারো সাথে

আপনার মিল খুঁজে পাই না। অথচ আপনার শিষ্যদের কেউ কেউ অত্যন্ত লোভী হয়ে পড়েছে। তারা হয়তো ভাবছে জীবনে তারা অনেক ত্যাগ-স্বীকার করেছে। আর কত করবে। অথবা ভাবছে সমাজে এই ত্যাগ স্বীকারের মূল্যই বা কোথায়? তাই তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে ধীরে ধীরে বিমর্ষ হয়ে পড়ছে। সংগ্রামের পথ পরিহার করে ব্যক্তি ভোগ লালসায় মনোযোগ দিচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে এক্ষেত্রে যে 'বনেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। আপনাদের কর্মীদেরকে ত্যাগের মহিমায় যত ভক্তি শ্রদ্ধা লাগে কিন্তু ভোগ বিলাসী হিসাবে ততটায় বিশ্রী লাগে। কথা হচ্ছে 'ভক্তি শ্রদ্ধা সেটাও একটা সম্পদ'। বরঞ্চ মানব সমাজে সবচাইতে বড় সম্পদ। যেমন এখানকার মন্ত্রী, এমপিদের নাম শুনলে সাধারণ মানুষ থুথু ফেলে। কারো কারো মনে বমি বমি ভাব হয়। কিন্তু আপনার মত সৎ ও ত্যাগী মানুষের উদাহারণ না দেখলে হয়তো কল্পরঞ্জন, দীপংকর আর বীর বাহাদুরকেই বড় লোক মনে করতো। ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য জানাতো। তাই বনে জঙ্গলে শান্তিবাহিনীর লোকজন নেই বলে সমাজে মদ খোর, জুয়া খোর ও মাদকাসক্তদের কত দৌরাত্ম্য বেড়েছে। পথে ঘাটে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা। অথচ শান্তিবাহিনীদের আমলে এসব কিছুই থাকতে পারতো না। এ কথাটা শুধু জুম্ম জনগণ নয় খোদ বাঙালীরাও স্বীকার করেন।

শুনেছি জাতীয় বেঈমান, ক্ষমতালোভীরাই আপনাকে মেরেছিল। অবশ্য যুগে যুগে এ ধরণের কাহিনী শোনা যায় - যেমন সিদ্ধার্থের আমলে তার বিপক্ষে ছিল দেবদত্ত। সিরাজউদ্দৌলার আমলে ছিল মীর জাফর। অবশ্য এ যুগে আপনার খুনী চক্রকে আপনার লোকজন পরাজিত করেছে। কিন্তু ইদানীং নতুনভাবে গজিয়ে উঠা কিছু ব্যাঙের ছাতার মত পাইপগানধারী কত নেতার আর্বিভাব যে হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। এরা কখনও ইউপিডিএফ নামে, কখনও ছাত্র পরিষদ নামে, কখনও শান্তি পরিষদ, কখনও কাবুসুক ও বিএমএসসি নামে ভিন্ন পরিবেশে বহুরূপী হয়ে আর্বিভাব ঘটাচ্ছে। তারা কথায় কথায় বলে তারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থী, তাদের দাবী তারা নাকি খাঁটি বিপ্লবী। কিন্তু কর্তব্য কর্মে দেখা যায় পাইপগান হাতে নিয়ে যত্রতত্র চাঁদাবাজী করছে। জনগণকে চাঁদার বোঝা চাপাচ্ছে। বাধ্যতামূলকভাবে ভাত পানি দিতে বলছে। আর সুযোগ পেলে জেএসএস ও পিসিপি কর্মীদের খুন করছে। এখন জনগণের দুঃখ-দুর্দশার শেষ নেই। একদিকে জনগণ সেটেলারদের থেকে জমি ফেরৎ পাচ্ছে না অন্যদিকে সরকার কখনও বনায়নের নামে, কখনও আর্মীদের নামে জমি অধিগ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছে। একদিকে কাপ্তাই বাঁধের ফলে সমস্ত সুজলা সুফলা জমি পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে পাহাড়ী লোকজনদের উদ্বাস্তু করেছে তদুপরি পাহাড়গুলোও আজ অধিগ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছে। জুম্মদের আর মোটেই জুম চাষ করতে দিতে চাচ্ছে না। এই অবস্থায় এইসব তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপন্থীরা কোন কথা বলে না; কোন কর্মসূচীও তাদের দেখা যায় না। তারা শুধুমাত্র বলছে জেএসএস মরে গেছে, জেএসএস পচে গেছে। এইসব বিভ্রান্তিতে কিছু কিছু জুম্ম বিমোহিত হলেও ইদানীং সব ভুল ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের সব লোকই বলতে শুরু করেছে যে, জুম্মদের স্বার্থে কোন কাজ করতে অথবা কোন আন্দোলন করতে লারমার জেএসএস ব্যতীত বিকল্প নেই। জনগণ যখন প্রশ্ন করে আপনারা হাতিয়ার ধরেছেন কার বিরুদ্ধে? কি জুম্মদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করবেন? উত্তরে তারা বলে ২০০১ সালে নাকি সরকারের সাথে যুদ্ধ করবে। ভগবান জানে এইসব পাইপগান দিয়ে, কক্কেয়া বন্দুক দিয়ে কতবড় যুদ্ধ তারা করবে। ইতিমধ্যে তাদেরকে দেখা যায় তারা সরকারী দলের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে। তাদের মধ্যে বলাবলি করতে শোনা যায় মন্ত্রী কল্প রঞ্জন আর দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর নাকি তাদের পক্ষে আছেন। আর ইদানীং দেখা যাচ্ছে বাবুছড়া এলাকায় তারা আর্মী ও পুলিশের সাথে একই জায়গায় সহাবস্থান করছে। দুপুরে সিভিল পোষাক পরে, রাত্রে আর্মীদের ব্যবহৃত ড্রেস পড়ে। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা ও অন্যান্য মামলা আছে শোনা যায় কিন্তু তারা সকলে সরকার ও সরকারী বাহিনীর সাথে উঠাবসা করে। আলাপ আলোচনা করে। সরকার তাদের ধরপাকড় করে না। খাগড়াছড়ি জেলার গাছবানের গিরিফুল এলাকায় মাঝে মাঝে ছাত্রলীগের ক্যাডারা উপদেশ পরামর্শ নেয়। শুনে তারা খুশী মনে ফিরে যায় গোপন আস্তানায়।

তারা নানাভাবে জনগণকে ধোঁকা দেবার ও বিভ্রান্ত করার কৌশল অবলম্বন করে। মাঝে মাঝে কাপড় পেছানো অস্ত্র প্রদর্শন করে এবং দাবী করে এইগুলো পাকিস্তান থেকে পায়। জনগণ বলাবলি করে ভাল অস্ত্র হলে আবার কাপড় পেছানো কেন? এযাবৎ কোন সশস্ত্র লোককে তো আমরা এভাবে দেখিনি। আমার ঘনিষ্ট বন্ধু যিনি ঐ সশস্ত্রদলের একজন কমান্ডার তার সাথে কথা বলে জানলাম - তারা নাকি ইদানীং বুদ্ধ ধর্মের জিগিরটা ব্যবহার করবে। যেসব জায়গায় তারা যেতে পারে না সেসব জায়গায় তারা বৌদ্ধ শ্রমণ হয়ে কাজ করতে যাবে। এখবর শুনলে লোকে বলাবলি করে আবার ধর্মের মধ্যে রাজনীতি টেনে আনছে। এখন তাদের রাজনৈতিক নুতন বক্তব্যের মধ্যে শোনা যাচ্ছে যে, জেএসএস ধর্মের উপর আঘাত করে এবং শান্তি প্রক্রিয়া মানে না। ভাবসাব এমন যে, যত শান্তি যেন তাদেরই।

যাই হোক প্রসঙ্গক্রমে চুক্তির কথা বলি। জুম্ম জনগণের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা অংশ আছে যাদের আন্দোলনে কোন অবদান নেই বরঞ্চ তারা কোন না কোনভাবে আন্দোলনে ক্ষতি সাধন করেছে তারাই চুক্তি মানে না। কারণ তারা মনে করে এই আন্দোলনের ফলে যে চুক্তিটা হয়েছে সেটা আন্দোলনকারীদেরই অগ্রদাবী থাকবে - তাদের অর্থাৎ চুক্তি বিরোধীরা এতে মোটেই লাভবান

হবে না । তাই তারা চুক্তি বিরোধীতা করছে। জুম্ম জনগণের বৃহত্তর অংশ লক্ষ লক্ষ জনতা কোন না কোনভাবে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কোন না কোনভাবে জনগণকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। তাই তারা মনে করেন আন্দোলনের এই চুক্তি তাদের ত্যাগেরই ফসল। অতএব এই চুক্তিকে তাদের মানতে হবে, বাস্তবায়ন করতে হবে।

চুক্তি বিরোধীরা গ্রামাঞ্চলে প্রচার করছে যে, এই চুক্তিতে জনগণের স্বার্থ কিছুই নেই। কিন্তু জনগণ দেখতে পাচ্ছেন তাদের দৈনন্দিন কাজে এই চুক্তি কোন না কোনভাবে কাজে লাগছে। তাই বিরোধীদের বক্তব্যকে সঠিক মনে করছে না। তাছাড়া চুক্তি বিরোধীরা যখন নতুনভাবে সশস্ত্র লড়াই এর কথা বলে তখন জনগণের বৃহত্তম অংশটি ভাবে তাহলে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে গিয়ে কি আবারো আগের মত ধরপাকড়, জেল-জুলুম, অত্যাচার, কারেন্টের শক আর বুলেট বেয়নেটের আঘাত পেতে হবে? আবারও কি অন্ধকার গর্তে ধুঁকে ধুঁকে থাকতে হবে? এসব কিছু চূড়ান্তভাবে ভাবতে গিয়ে বলে উঠে - না। আর নয়। আপাততঃ শান্তি অবশ্যই প্রয়োজন। তাই জনগণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আর চুক্তি বিরোধীদের সমর্থন দিতে পারে না। এইসব কথা ও কার্যকলাপ এইটুকুই প্রমাণ করে যে আপনার নীতি-আদর্শে গড়া পার্টির সিদ্ধান্তই সঠিক। তাই আবারো আপনার দুরদর্শিতার পর্যালোচনা হচ্ছে এবং জনগণ আপনার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আরো বেশী গুণকীর্তন করছে।

কাজেই ভয়ের কিছু নেই। চুক্তি বিরোধীরা ক্রমেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যেভাবে গৃহযুদ্ধে আপনার আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছিল ঠিক সেইভাবে রাজনৈতিক বিজয় আপনার হবে এব্যাপারে জনগণ নিশ্চিত।

এ চিঠির কলেবর বৃদ্ধি করতে না চাইলেও আরো কয়েকটা কথা না বললে মনে হয় অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। চুক্তির একটা পক্ষ বাংলাদেশ সরকার যদিও দাবী করে সে গণতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু তার শাসনামল শেষ হতে চলল তবুও তিনটি পার্বত্য জেলায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে পারল না অথবা বলা যায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কোন চেষ্টাই করেনি। জুম্ম জনগণ যাতে নিজেদের স্বার্থে এই চুক্তিকে লাগাতে না পারে তজ্জন্য সরকার সর্বক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করার জন্য তার আমলা বাহিনীকে যেমনি কাজে লাগাচ্ছে তেমনি কাজে লাগাচ্ছে তার মনগড়াভাবে নিয়োগ দেওয়া জেলা পরিষদের ভক্ষকদের। তাই জনগণ মনে করে এ সরকার যতটা গণতান্ত্রিক ততোধিক দলতান্ত্রিক। শুধু নিজের দলের লোকদেরই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সময় কাটাতে চায়। জনগণ আর তাকে ভোট দেবে না বলে স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুনেছি আপনি জনগণকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখতেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আপনার খুবই প্রিয়। তাই জনগণ আপনার আদর্শের প্রতিফলন চায়।

বর্তমান সরকার আর্মীদেরকে দারুণভাবে ভয় করে আর সাংঘাতিক ভয় করে সেটেলারদের। তাই সরকার এখন উভয় সঙ্কটে। চুক্তির প্রধান প্রধান ধারাগুলো কার্যকরী করতে চাইলে সেটেলারদের ক্ষেপানো হবে সেই সাথে আর্মীরা জ্বলে উঠবে। তাই সরকার এই অজুহাত সৃষ্টি করে ভূমি কমিশন গঠন করতে চায় না, চুক্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুত করছে না। জুম্মদের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে জুম্ম জনগণ ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে এবং বলতে শুরু করছে - জুম্ম জাতির জন্য লারমার আদর্শের বিকল্প নেই।

এসব কথা লিখতে গিয়ে হয়তো অনেককে কষ্ট দিলাম। বিশেষতঃ গোপন চিঠি হলে কোনমতে চলতো কিন্তু এ যে খোলা চিঠি। এজন্য উল্লেখিত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু মাফ চাইবো না শুধু আপনার কাছে - কেননা আমি জানি এবং স্থির বিশ্বাস করি যে আপনি নাকি খুবই ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছিলেন। নিজে তো পোকামাকড় মারতেন না অন্যকেও আপনার সামনে নাকি মারতে দিতেন না। সুতরাং বাস্তব বিষয়বস্তুর কারণে ক্ষমা না চাইলেও অপনার কাছ থেকে মাফ পাবো এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আশীর্বাদ করবেন যাতে ভবিষ্যতে আপনার প্রদর্শিত পথ ধরে আমিও হাঁটতে পারি। এর চেয়ে বিশেষ কি আর লিখি।

ইতি
আপনারই স্নেহধন্য
সুদৃষ্টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা

মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমধানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্ট গ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' - যা 'পার্বত্য শান্তি চুক্তি' নামে সমধিক পরিচিত - সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তি দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রসংশিত ও সমাদৃত হয় এবং আপামর জুম্ম জনগণ এই চুক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকারসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই চুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

পক্ষান্তরে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমন্সে ফেডারেশনের একটি ক্ষুদ্র অংশ দুই বিপরীত অবস্থান থেকে স্ব স্ব সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তব-বিবর্জিত যুক্তি অবতাড়না করে চুক্তি-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং গোড়া থেকেই চুক্তি বানচালের ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে।

এই চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের নীলাকাশে শান্তির সুবাতাস বয়ে আসবে এবং জীবনমুখী সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জুম্ম জাতীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি চলে আসবে - এই আশা নিয়ে আপামর জুম্ম জনগণ এই চুক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যে, একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থী চুক্তি-বিরোধী গোষ্ঠীর নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়ন বানচাল করার অপচেষ্টা, অপরদিকে সরকারের একটি সুবিধাবাদী বিশেষ মহল সরকারী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপব্যবহারের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ফলে বর্তমানে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতি ও অনিয়মিত। তাই চুক্তির কতিপয় দিক বাস্তবায়িত হলেও চুক্তির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক বাস্তবায়নে সরকার এখনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ঝুলিয়ে রেখে চলেছে। পক্ষান্তরে 'চুক্তি লঙ্ঘন করে ও চুক্তির মৌলিক স্পিরিট পরিপন্থী অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার হাতে নিয়েছে। নিম্নে চুক্তির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো ঃ-

চুক্তির প্রস্তাবনা ও অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রারম্ভে প্রস্তাবনায় লেখা আছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

চুক্তির উক্ত প্রস্তাবনা অংশে বর্ণিত ''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা'' কথাগুলির মধ্যে বিশেষতঃ 'সকল নাগরিকের' কথা দ্বারা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নাগরিক বা বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বা অবস্থানরত সকল নাগরিকের কথাই বুঝানো হয়েছে । কারণ চুক্তিতে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারা সাপেক্ষেই তা বুঝতে হবে।

অথচ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জারী করা হলেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উন্নয়ন বোর্ড এবং জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট তা প্রেরণ করা হয়নি। চুক্তি সম্পর্কে এবং চুক্তির বিভিন্ন ধারা বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা অদ্যাবধি প্রেরণ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে বারবার দাবী উত্থাপন করা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ হতে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলার সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও বিভাগ হতে চুক্তি যথাযথভাবে

বাস্তবায়নে উদ্যোগ বা সহযোগিতার আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরঞ্চ যতদুর সম্ভব চুক্তি ও চুক্তির ধারাসমূহ সম্পর্কে অপব্যাখ্যা পূর্বক তা লঙ্ঘন করে কর্ম সম্পাদনের প্রবনতা বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে উক্ত 'সকল নাগরিকের' কথাগুলি দ্বারা সরকারী পরিকল্পনাধীনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত বাঙালী সেটেলার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত প্রবেশকৃত বা প্রবেশরত অন্যান্য বাঙালী সেটেলারদেরকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক বা বাসিন্দা বা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে চুক্তিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে বলে অপব্যাখ্যা দিয়ে আগেকার মতো তাদের অনুকুলেই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের বা ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে।

অপরদিকে চুক্তির 'ক' খণ্ডের ১নং ধারায় উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। চুক্তির এই ধারায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন অর্জনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কোন পদক্ষেপ সরকার পক্ষ হতে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে উপজাতি তথা স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াই অব্যাহত রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলীতে ৩৩ (তেত্রিশ) টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে ১৯৮৯ হতে অদ্যাবধি তফসিলভূক্ত তিনটি বিষয় ও নয়টি কর্ম লিখিতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুক্তি মোতাবেক আইন সংশোধন

চুক্তির 'ক' খণ্ডের ২নং ধারায় উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে বলে স্থির করা হয়।

১৯৯৮ইং সনের ৩, ৪, ৫ ও ৬ মে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এবং বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ইং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং ২৮শে মে ১৯৯৮ তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্য-বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম বৈঠক ২১মে মার্চ ১৯৯৮ইং খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে - তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপনের আগে সরকারের তরফ থেকে জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির মতামত নেওয়ার পর বিলগুলো সংসদে উত্থাপন করা হবে।

কিন্তু উল্লেখিত বিলগুলো জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণের আগে, এমনকি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বিল ১লা এপ্রিল ১৯৯৮ইং জাতীয় দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত উক্ত বিলে উভয় পক্ষে সম্পাদিত চুক্তির সাথে অসংখ্য বিরোধাত্মক ধারা সন্নিবেশ করা হয়। তাই উক্ত বিলসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধনী) আইনের বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপনের পূর্বে জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে ৮ এপ্রিল ১৯৯৮ইং সরকারের নিকট চিঠি প্রেরণ করা হয় এবং জনসংহতি সমিতির মতামত না পাওয়া পর্যন্ত বিলসমূহ সংসদে উত্থাপন না করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। অন্যথায় প্রণীত বিল/আইনসমূহ সমিতির পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না বলে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণের আগে এবং সমিতির কোন প্রকার মতামত না নিয়ে ১২ এপ্রিল ১৯৯৮ইং বিলসমূহ যথা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এবং বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ইং সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং তার পরদিন উক্ত বিলসমূহ স্থায়ী/বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ' করা হয়। উহার ফলে জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী পেশাজীবি ঐক্য পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনতিবিলম্বে বৈঠক অনুষ্ঠানের আহবান জানানো হয়।

ইহার প্রেক্ষিতে ১৮-২০ এপ্রিল ১৯৯৮ইং উল্লেখিত ৪টি বিলে সন্নিবেশিত বিরোধাত্মক ধারাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ৪টি বিলে বিদ্যমান বিরোধাত্মক ধারাসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং এসব অসংগতি সংশোধন করে সংসদে বিলসমূহ উত্থাপন ও পাশ করা হবে বলে সরকার পক্ষ পূর্ণ আশ্বাস

প্রদান করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবক'টি বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না করে স্থায়ী/বিশেষ কমিটি কর্তৃক ২৯ এপ্রিল ১৯৯৮ইং বিলসমূহ সংসদে উত্থাপন করা হয়। ইহাতে জনসংহতি সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং সাথে সাথে একজন শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি ঢাকায় প্রেরণ করে। এ প্রতিনিধি ঢাকায় চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সংসদের ডেপুটি লিডার ও এলজিইডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, আইন ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের সাথে ৩ মে ১৯৯৮ইং বৈঠক করেন। ইহার পরও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বিদ্যমান বিরোধাত্মক ধারাসমূহ বলবৎ রেখে উল্লেখিত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের বিল যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ মে ১৯৯৮ইং সংসদে পাশ করা হয়। ফলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনে চুক্তির সংগে বিরোধাত্মক ৪টি ধারা এবং খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনে একটি করে চুক্তির সঙ্গে বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত বিরোধাত্মক ধারাসমূহ চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংশোধন করার জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বহু বার দাবী উত্থাপন করা হয়। অনেক বিলম্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনে ''স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা'' সংজ্ঞা সম্পর্কিত ধারা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংশোধন করা হয়। কিন্তু অপরাপর ধারাসমূহ সংশোধন সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে ও অন্যান্য উপায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট বারবার উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি সংশোধন করা হয়নি। ফলতঃ চুক্তি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে (বিরোধাত্মক ধারাসমূহ পরিশিষ্ট-১-এ সংযুক্ত করা হল)।

এছাড়া চুক্তির এই ধারা অনুযায়ী অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহিত কোন প্রকার আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে বন আইন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত ধারা প্রভৃতি একতরফাভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এনজিও কার্যাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইহার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যেভাবে তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মতামত ব্যতিরেকে বা তোয়াক্কা না করে তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে এবং স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি একতরফাভাবে একের পর এক সংশোধন করে গেছে তেমনিভাবে একই কায়দায় বর্তমান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইনসমূহ সংশোধন করে চলেছে।

চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

চুক্তির 'ক' খণ্ডের ৩ নং ধারায় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন সদস্যকে আহবায়ক এবং চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য করে তিন সদস্যর একটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান করা হয়। চুক্তির এই ধারা অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ২১শে মার্চ, ১৬ই এপ্রিল, ৭ই আগষ্ট ও ২রা নভেম্বর মোট ৪ (চার) বার কমিটির বৈঠক হয়েছে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও এসব বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করতে সরকার পক্ষ সম্মত হননি। বৈঠকে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেসব বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সরকার পক্ষ হতে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বা উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে ফলপ্রসু কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিশেষতঃ চুক্তির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মৌলিক বিষয়সমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বার বার দাবী করা সত্ত্বেও ১৯৯৮ সালের ২রা নভেম্বরের পর আজ প্রায় দু' বছর ব্যাপী এ কমিটির কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। বর্তমানে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে বলা যায়।

চুক্তি বলবৎকরণ

চুক্তির 'ক' খণ্ডের ৪ নং ধারায় উভয়পক্ষ কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে এবং বলবৎ হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে বিধান করা হয়েছে। চুক্তির এই ধারা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ হতে এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আদেশ, নির্দেশ বা পরিপত্র প্রেরণ করা হয়নি। ফলে চুক্তির ধারাসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে কোন সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং চুক্তি সম্পর্কে অবহিত নন বা চুক্তি অনুযায়ী আইন বলবৎ হয়নি ইত্যাদি অজুহাতে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে চুক্তি বা সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা হচ্ছে।

অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা ও সনদপত্র

চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩নং ধারায় ''অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা'' বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে বলে বিধান করা হয়েছে। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এই ধারা ও আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে এর বাস্তবায়ন বা কার্যকরকরণে বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

চুক্তির ৪(ঘ)নং ধারায় বিধান করা হয়েছে যে - ''কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসেবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না''। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারা ও আইন সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়নে বিরোধিতা করে যাচ্ছে। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য পদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ চুক্তির উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান বলবৎ রেখেছে। ফলতঃ বহিরাগতদেরকেও জেলা প্রশাসকগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করে চলেছে। সমতল জেলা থেকে এসব বহিরাগতরা স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্রের বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে জায়গা-জমি ও চাকুরীসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদি গ্রহণ করে চলেছে।

ভোটার তালিকা

চুক্তির ৯নং ধারায় বিধান করা হয় যে, ''আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি পার্বত্য জেলায় ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁর বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করে থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন''।

এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও ইহা লঙ্ঘন করে স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫ই মে হতে ২৪শে জুন, ২০০০ পর্যন্ত খসড়া নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অস্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদের এ ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

নুতন ভোটার তালিকায় অউপজাতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটেলারদের বাদ দিয়ে কেবল স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের জনগণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক জানানো হয় যে, উক্ত ভোটার তালিকা জাতীয় সংসদ এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের জন্য চুক্তির উক্ত ধারা অনুযায়ী স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদের অর্ন্তভুক্ত করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

এই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট পুনরায় স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে (উক্ত স্মারকলিপি পরিশিষ্ট-২-এ সংযুক্ত করা গেল)। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে সরকার অথবা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ অস্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদেরসহ প্রণীত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হিসেবে গত ২৮ অক্টোবর ২০০০ইং প্রকাশ করা হয়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে গত ২৬ অক্টোবর ২০০০ইং ভোটার তালিকা থেকে অস্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদের নাম বাতিল করার আর্জি জানিয়ে অস্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদের তালিকাসহ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে জগদীশ চন্দ্র চাকমা এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে ভবদত্ত চাকমা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট দরখাস্ত প্রদান করেন। এ বিষয়ে দ্রুত তদন্ত করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে আশ্বাস প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, চুক্তি লঙ্ঘন করে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের দাবীকে উপেক্ষা করে সরকার সেটেলারদেরসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে বিভিন্ন এলাকায় জনগণের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান করা হয় । এই প্রেক্ষিতে সরকার এক পর্যায়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করে । ইহার ফলে পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । ইহার মধ্য দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের চরম অসদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন ।

উন্নয়ন সংক্রান্ত

চুক্তির 'খ' খন্ডের ১৯নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে'।

এই ধারা যথাযথভাবে আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি । দাবীর প্রেক্ষিতে বারবার আশ্বাস/প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক সংশোধন করা হয়নি । বরঞ্চ নিম্নোক্তভাবে ইহা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছেঃ

(ক) পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত কর্ম বা প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে,

(খ) জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত হস্তান্তরিত কোন বিষয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

বর্তমানে অধিকাংশ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (UNDP) Chittagong Hill Tracts Participatory Planning Exercise-এর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও ইউএনডিপির মধ্যে ২৯/৯/১৯৯৯ইং ঢাকায় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকার এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে ইউএনডিপির এই উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারেনি এবং এই পরিকল্পনার অধীনে স্থানীয় তিনটি এনজিও'র সহায়তায় আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক Quick Impact Project চিহ্নিতকরণের প্রকল্পও সরকার এখনো ঝুলিয়ে রেখেছে। অতিসম্প্রতি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য দশশালা উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছে। উক্ত খসড়া পরিকল্পনায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে রাখা হয়েছে। এতেও সরকার বিরোধীতা করে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য জেলা পুলিশ

চুক্তির ২৪(ক) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, 'আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও এই ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদকে কার্যকর করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নেওয়া হয়নি। তাই পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বরাবরই জুম্মদের উপর জুলুম ও হয়রানি করে যাচ্ছে। জুম্মদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে চরম হয়রানিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে জুম্মরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। গত ২৭ আগষ্ট ২০০০ইং রাঙ্গামাটিস্থ আমানতবাগের সেটেলারদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি শহরের কলেজ গেইটের বাজারে আসা জুম্মদেরকে হামলা করলে পুলিশের সদস্যরা বাঙ্গালী সন্ত্রাসী প্রত্যাক্ষভাবে সহায়তা ও মদত যোগায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উত্তেজনা-প্রবন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হলেও জুম্মদের উপর আক্রমণের সময় প্রতিহত করার পরিবর্তে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা পেছন থেকে সন্ত্রাসীদের নিরাপত্তা ও সাহায্য দিয়ে থাকে এবং পক্ষান্তরে কোন জুম্ম যদি সন্ত্রাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করলে চাইলে তাকে ধাওয়া করে থাকে।

এভাবেই প্রতিনিয়ত জুম্মরা পুলিশী হয়রানির শিকার হচ্ছে। তাই জনসংহতি সমিতিসহ জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে বার বার দাবী করা হচ্ছে যে, অচিরেই পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে পুলিশ বিষয়টি হস্তান্তর করা ও পাশাপাশি বর্তমান পর্যায়ে নিরপেক্ষভাবে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে মিশ্র পুলিশবাহিনী গঠনের জন্য সমতল জেলায় কর্মরত জুম্ম পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলী করা হোক। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে আজ অবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ভূমি সংক্রান্ত

চুক্তির ২৬(ক) ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, 'আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি সহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না'। এই ধারা রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। দাবীর প্রেক্ষিতে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন এখনো সংশোধন করা হয়নি । উক্ত আইনের শর্তাংশে 'সরকারের নামে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে' শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় পরিষদকে বুঝানো হয়ে থাকে। আইনটি কার্যকর করা হচ্ছে না এবং জেলা পরিষদেও বিষয়টি অদ্যাবধি হস্তান্তর করা হয়নি।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে জেলা প্রশাসকগণ বন্দোবস্ত প্রদান করে চলেছেন। জেলা প্রশাসকগণ এই যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এখনো বলবৎ রয়েছে। অথচ পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, 'আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন'। আইনের এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা জেলা প্রশাসকের উক্ত ক্ষমতা কোনক্রমেই থাকতে পারে না।

চুক্তির ২৬(খ) বিধান করা হয়েছে যে, 'আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও এই আইন অনুসরণ করা হচ্ছে না। তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ এই আইন লঙ্ঘন করে ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করে চলেছেন। এ প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিষদ হতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকদের নিকট ভূমি ইজারা, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর বন্ধ রাখার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বান্দরবন জেলার জেলা প্রশাসক প্রত্যুত্তরে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ সাল অনুযায়ী জেলা প্রশাসক উক্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ সাল' অনুযায়ী উক্ত ভূমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। এই বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ জুলাই ১৯৮৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন অস্বীকার করে চলেছেন।

চুক্তির ২৬(গ)নং ধারায় লেখা হয়েছে যে, 'পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার(ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও এই ধারা অনুযায়ী পরিষদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

চুক্তির ২৬(ঘ)নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, 'কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও এই আইন প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

জেলা পরিষদে বিষয় হস্তান্তর

চুক্তির ৩৩নং ধারা মোতাবেক আইন-শৃংখলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উহার উন্নতি বিধান, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও সংরক্ষিত বন এবং চুক্তির ৩৪ ধারা মোতাবেক (ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; (খ) পুলিশ (স্থানীয়); (গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; (ঘ) যুব কল্যাণ; (ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; (চ) স্থানীয় পর্যটন; (ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; (জ) স্থানীয় শিল্প বানিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; (ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; (ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; (ট) মহাজনী কারবার; (ঠ) জুম চাষ ইত্যাদি বিষয়সমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলীতে অন্তর্ভূক্ত করার বিধান করা হয়েছে।

এই ধারাসমূহ আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয় বিগত আড়াই বছরে একটিও জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া ১৯৮৯ সালে প্রণীত আইনে অন্তর্ভূক্ত ২২টি বিষয়ের মধ্যে মাত্র ৫টি বিষয় জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছিল। অবশিষ্ট বিষয়গুলোও এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। গত ১২ই জুন, ২০০০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবের পরিচালনাধীনে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মকর্তা পর্যায়ে যুবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা হস্তান্তর বিষয়ে সভা হয়েছে এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু আইন-শৃংখলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উহার উন্নতি বিধান, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বর্তমানে বা নিকট ভবিষ্যতে হস্তান্তর করার সরকারের কোন চিন্তাভাবনা নেই বলে বিশ্বস্থসূত্রে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন

চুক্তির 'গ' খন্ডের ১নং ধারায় পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার বিধান করা হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৯৮ সনের ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইন জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং ২৫শে মে ১৯৯৮ইং সরকারী গেজেট প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধিসহ অন্য কোন বিধি সরকার কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়ন করা হয়নি। বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের নিকট সরকারী আদেশ বা পরিপত্র প্রদানের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাব সরকারের নিকট দেওয়া হয়েছিল এবং ২১ মে ২০০০ইং এবং ১৩ আগষ্ট ২০০০ইং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সরকার পক্ষ হতে এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পরিষদের আইন অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের বিধান কার্যকর করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক করা হয়নি। এ

প্রেক্ষিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে চুক্তি ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন সম্পর্কে কোন আদেশ বা পরিপত্র না পাওয়ায় অবহিত নহেন বলে যুক্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধান প্রণীত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনে অদ্যাবধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহেন বলেও মনগড়া যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে। অথচ গেজেটে আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর হওয়ার সময়ও উল্লেখ করা রয়েছে।

আঞ্চলিক পরিষদের আইনে বলা হয় যে, 'আঞ্চলিক পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। এছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৮ সালে ৭১ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ তা অমান্য করে। ফলে উক্ত বিষয়টি আঞ্চলিক পরিষদ হতে সরকারের নিকট প্রেরিত হয় । সরকার কর্তৃক ঐ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়নি। এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বিরোধীতা ও অসহযোগিতা করে যাচ্ছে।

আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলীতে লেখা হয়েছে যে, 'তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলা প্রশাসকগণ, পুলিশ সুপারগণ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রেখেছেন। ফলে এতদবিষয়ে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ বিরোধীতা ও অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিও-দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন, ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতাও আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এই খাতে সরকারী বরাদ্দও অনুরূপভাবে প্রদান অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এই খাতে ১৯৯৯-২০০০ সালো বাজেটে আঞ্চলিক পরিষদ হতে অর্থ ও খাদ্যশস্য বরাদ্দ দাবী করা হয়েছিল। মাত্র ৫০০ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন অর্থ বা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়নি।

অপরদিকে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন যোগাযোগ ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা সার কারখানা স্থাপনের জন্য প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ হতে লাইসেন্স নেওয়ার পরিবর্তে সরকার কর্তৃক উক্ত লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্ব পালনে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধানের কোন অবকাশ রাখা হয়নি। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করেই সরকারের সহযোগিতায় উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম চলছে।

চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১৩নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, 'সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবেন এবং তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন'। এই ধারা আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। অসংগতি দূরীকরণে সরকার কর্তৃক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা বা ইহার পরামর্শ গ্রহণ করেনি বা করছে না। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বন আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত ধারা সংশোধনের ক্ষেত্রে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রম নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন আলোচনা বা পরামর্শ করেনি। একতরফাভাবে প্রণয়ন বা সংশোধন করেছে।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১নং ধারায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ইং স্বাক্ষরিত ২০-দফা প্যাকেজ সুবিধা সম্বলিত চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ ১৯৯৭ইং হতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মোট ৬৪,৬০৯ জন (১২,২২২ পরিবার) শরণার্থী দেশে ফিরে আসেন। তাদেরকে এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী জমি ও ডিটেমাটি

ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা-জমি এখনো অবৈধভাবে সেটেলারদের দ্বারা দখল হয়ে আছে। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে--

# বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি	-	১৩৩৯ পরিবার
# বাগানভিটা ফেরৎ পায়নি	-	৭৭৪ পরিবার
# ধান্যজমি ফেরৎ পায়নি	-	৯৪২ পরিবার
মোট জমি-জমা ফেরৎ পায়নি	-	**৩০৫৫ পরিবার**
# হালের গরুর টাকা পায়নি	-	৮৯০ পরিবার

স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি-৬টি
স্থানান্তরিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয় --৫টি
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির -৭টি
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম--- ৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা- ৬৪২জন

আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১নং ধারায় তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বলা হয়ে থাকে। এই ধারা মোতাবেক এখনো আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি। চুক্তিতে কেবল আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ থাকলেও সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বারবার আপত্তি সত্ত্বেও টাস্কফোর্স কর্তৃক সেটেলারদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিহ্নিত করে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের নবম সভা ত্যাগ করেন এবং সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিলের দাবী পুরণ না হওয়া পর্যন্ত টাস্কফোর্সের কোন সভায় যোগদান করবেন না বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এই মর্মে তারা যৌথভাবে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হতে কোনরূপ উত্তর প্রদান করা হয়নি। বরং টাস্কফোর্সের ১৫ই মে ২০০০ইং তারিখের একাদশ সভায় ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় (সেটেলার) পরিবারকে অর্থাৎ মোট ১,২৮,৩১৪ পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরিবার প্রতি নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে । এ প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের জনগণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন করা হয়েছে যে-

(১) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ইং তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(২) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

(ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

(৩) টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

কিন্তু সরকার পক্ষ হতে এ বিষয়ে কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। (পরিশিষ্ট-৩-এ প্রধানমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি সংযুক্ত করা হলো)।

ভূমি জরিপ

চুক্তির 'গ' খন্ডের ২নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 'সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন'। এই ধারা বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যেহেতু উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

ভূমিহীন পুনর্বাসন

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৩নং ধারায় সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করা এবং যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে আইন লংঘন করে জুম্মদের বাস্তুভিটা ও জায়গাজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। জুম্মদেরকে নিজ জায়গাজমি থেকে উচ্ছেদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে।

ল্যান্ড কমিশন

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৪নং ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, 'জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত

বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে এবং পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সেসমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রীজল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে'।

এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন এখনো গঠিত হয়নি। কেবলমাত্র ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। ৩রা জুন, ১৯৯৯ তারিখে জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে ল্যান্ড কমিশন গঠন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহনের আগে ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৫ই এপ্রিল, ২০০০ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি গত ১২ই জুন, ২০০০ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ল্যান্ড কমিশন কার্যালয় পরিচালনার জন্য কোন কর্মকর্তা অদ্যাবধি দায়িত্ব গ্রহণ করেননি এবং কার্যালয়ও স্থাপন করা হয়নি। অপরদিকে মং চীফ ও বোমাং চীফ এর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা এখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সরকার কর্তৃক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ সমস্যাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা না হলে মং ও বোমাং সার্কেলে ভূমি কমিশনের কাজ চালানো সমস্যা হতে পারে। এ সমস্যার কারণে প্রাথমিকভাবে চাকমা সার্কেলে ভূমি কমিশনের কাজ শুরু করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তা শুরু হয়নি।

ভূমি ইজারা বাতিল

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৮নং ধারায় যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে বলে লেখা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ অনুরূপ জমি বরাদ্দ কোন কোন জায়গায় অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবন জেলায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বান্দরবন জেলার একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি কত ভয়াবহ তা আচ করা যাবে। গত জুন মাসে বান্দরবন সদর থানার সুয়ালক মৌজার ৭০৪ হতে ৭০৬ নং হোল্ডিং এবং তুমক্রু মৌজার ৬৩ থেকে ৬৭ নং হোল্ডিংয়ের প্রতি হোল্ডিংয়ে ২৫ থেকে ৫০ একর করে জমি জেলা প্রশাসক তার নিজের আত্মীয়, পুলিশ সুপার, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও রাজস্ব) ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরিবার-পরিজনের নামে রাবার/হর্টিকালচার প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বেআইনী ভূমি দখলের তৎপরতায় জেলা ও থানা পর্যায়ের আরো ৪০ জন কর্মকর্তা জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৯নং ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, 'সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন। সরকার এ অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন'। এ ধারা অনুসারে সরকার কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা হয়নি। পর্যটন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহিত কার্যকর কোন আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি।

অতীতের উন্নয়ন ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দাবী হচ্ছে - পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্থায়ী অধিবাসীদের মতামত ও আশা-আকাঙ্খার ভিত্তিতে হতে হবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পার্বত্য অধিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সরকার পার্বত্য অধিবাসীদের সেই মতামতকে তোয়াক্কা না করে আগের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১০নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, 'চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন'।

এ ধারা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিশেষতঃ কোটা ব্যবস্থাধীনে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের জন্য চট্টগ্রামস্থ জিওসি সেনা প্রশাসন জড়িত থাকায় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংরক্ষণে অসুবিধা সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে।

উপজাতীয়দের স্থলে অউপজাতীয়দের এ কোটায় ভর্তি করা হয়ে থাকে। গত শিক্ষাবর্ষে খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় থানা (প্রকৃতপক্ষে রাউজান থানা) হতে মিস শ্যামা মহাজন নামে একজন অউপজাতীয় ছাত্রীকে উপজাতীয়দের কোটায় ভর্তি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোটা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় জিওসি-র পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেয়ার জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব সরকার পক্ষ হতে বিবেচনা বা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য কোন বৃত্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখা

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১১নং ধারায় উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে জুম্মদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য অতি সুক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

মামলা প্রত্যাহার

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬(খ)নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, 'জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকলে তাকেও মুক্তি দেওয়া হবে'।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তম্মধ্যে এখনো ৪৭৪ মামলা অপ্রত্যাহৃত রয়ে গেছে। বিশেষতঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া সামরিক আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহও অপ্রত্যাহৃত রয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল--

জেলা	মামলার সংখ্যা	প্রত্যাহৃত মামলা	অপ্রত্যাহৃত মামলা
রাংগামাটি	৫১০	৮০	৪৩০
খাগড়াছড়ি	৪৫১	৪০৫	৪৬
বান্দরবন	৩৮	৩০	৮
মোট	৯৯৯	৫১৫	৪৭৪

জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯জন বন্দী সদস্য মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু বাকী দু'জন বন্দী সদস্য শ্রী বীর সেন চাকমা পীং অংশু মণি চাকমা এবং বিনেন্দ্র চাকমা পীং তরণী চন্দ্র চাকমা এখনো মুক্তি পাননি।

১৬নং ধারা (গ) উপধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, 'অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না'। সমিতির সদস্য ছিলেন বলে আইনগতভাবে ঘোষণা দিয়ে বন্দী করা না হলেও কার্যতঃ সমিতির সদস্য ছিলেন এই কারণে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজনকে নানা অজুহাতে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী করা হয়েছে। গত ১৯৯৯ইং রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী থানায় সাধন তঞ্চঙ্গ্যা নামে প্রত্যাগত একজন সদস্যকে বন্দী করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা থানায় সেনাবাহিনী কর্তৃক সমিতির প্রত্যাগত সদস্য মংসাথোয়াই মারমাকে প্রথমে গ্রেপ্তার ও পরে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা ও অলিয়া চাকমা ওরফে সুপ্রীমকে বেদড়ক মারধর করা হয়। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় ত্রিলোচন চাকমা ওরফে অনুভূতি ও কালায়ন চাকমাকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। অপরদিকে নিখিল জীবন চাকমার মামলা প্রত্যাহৃত হলেও এখনো তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি রয়েছে এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য খুঁজছে।

ঋণ মওকুফ

১৬(ঘ)নং ধারায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে বলে বলা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে ৪ (চার) জন সমিতির সদস্য সুনীল তালুকদার পীং সুধীর চন্দ্র তালুকদার, রত্ন বিকাশ চাকমা পীং পূর্ণচন্দ্র চাকমা, জ্যোতির্ময় চাকমা পীং সিংহ মনি চাকমা ও হৃদয় রঞ্জন চাকমা পীং তুক্ক চন্দ্র চাকমার ঋণ মওকুফের আবেদন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

চাকুরীতে পুনর্বহাল

১৬(ঙ)নং ধারায় বলা হয় যে, 'প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে এবং এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হবে'।

এ ধারা মোতাবেক পূর্বে চাকুরীরত ছিলেন এমন ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তম্মধ্যে ৬৩ জনকে পুনর্বহাল করা হলেও এখনো ১৫ জন সদস্যকে পুনর্বহাল করা হয়নি। যারা চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি দেয়া প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের নিকট তাদের বারবার আবেদন সত্ত্বেও সরকার এবিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে তারা চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেও চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। অপরদিকে যাদের চাকুরী বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের অবসর ভাতা বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হতে সরকার বিরত রয়েছে। মোট ৬৭১ জন পুলিশ কনষ্টেবল পদে এবং ১০জন ট্রাফিক সার্জেন্ট পদে ভর্তি হয়েছিলেন। ট্রাফিক সার্জেন্ট পদে প্রিয়দর্শী চাকমা নামে আরো একজনকে মনোনীত করা হলেও এখনো প্রশিক্ষণার্থে ভর্তি করা হয়নি। কোন কোন জেলায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সহায়ক হলেও বিভিন্ন স্থানের পুলিশ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অনুকূল না হওয়ায় পুলিশ কনষ্টেবলরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং এর প্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক পুলিশ কনষ্টেবল চাকুরী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট সমিতির সদস্যদের চাকুরীতে নিয়োগ বিষয়ে বয়স ৪০ বৎসর পর্যন্ত তিন বছরের জন্য শিথিল করার সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরন করা হচ্ছে না।

সহজ শর্তে ঋণ

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬(চ) ধারায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের কথা রয়েছে। এধারা মোতাবেক ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প সরকারের নিকট জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য এখনো কোন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

গত ১৭ অক্টোবর ১৯৯৯ইং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পসমূহের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনার জন্য এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শফিকুল ইসলাম (প্রধান), বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঐ কমিটি জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়ে ১৫ দিনের মধ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে এবং তদনুসারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু আজ অবধি উক্ত কমিটির কোন বৈঠক বা উক্ত কমিটি কর্তৃক কোন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

বৈদেশিক সার্টিফিকেট বৈধকরণ

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৬(ছ) ধারায় জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির সদস্য শ্রী প্রতিবিনয় চাকমার ছেলে শ্রী উজ্জ্বল চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নতুন বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে মহালছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড তাকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সুযোগ দিলেও রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও পাশ সার্টিফিকেট দেয়নি।

অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭(ক) ধারায় উল্লেখ আছে যে, 'সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এলক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে'।

চুক্তির এ ধারা মোতাবেক সরকার অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারে গড়িমসি করে চলেছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর দীর্ঘ আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ক্যাম্প প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এখনো সময়-সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-আমলাগণ কখনো ৬২টি ক্যাম্প, কখনো ৭২টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা বললেও জনসংহতি সমিতির তথ্য মোতাবেক বস্তুতঃ পক্ষে বিগত আড়াই বছরে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় ৫ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে। কোন কোন ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহৃত হলেও সেখানে আবার অন্যান্য আধা-সামরিক সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে। ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিবরণ নিম্নরূপ--

পত্র	সূত্র	প্রত্যাহৃত ক্যাম্প সংখ্যা
পাচবিম(সম-১)১০৩/৯৮/৮৬ তাং ১৫/০৪/৯৯	সেনা সদর দপ্তর, ২০ আগষ্ট'৯৮, ৩ সেপ্টেম্বর'৯৮	১০টি
	২ মার্চ'৯৯	১টি
	২২ মার্চ'৯৯	৮টি
	২৫ মার্চ'৯৯	২টি
পাচবিম (সম-)১০৬/৯৮/১৩০ তাং ১০/০৬/৯৯	---	১০টি
মোট		৩১টি

উক্ত ১৭ ধারার (খ) উপধারা মোতাবেক সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করার কথা থাকলেও প্রত্যাহৃত ৩১টি ক্যাম্পের জায়গা মূল মালিক বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। পক্ষান্তরে রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর, বান্দরবান সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য ১৮৩ একর, আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৩০,০০০ একর, বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর এবং লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সরকার সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কোনা সদিচ্ছা নেই এবং বিশেষতঃ চুক্তির মৌলিক ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নের কোন পরিকল্পনা নেই।

জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগ

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৮নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা এবং কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করার কথা থাকলেও এই ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সমতল জেলায় চাকুরীরত জুম্ম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলীর প্রস্তাব করা হলেও সরকার পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ হয়নি। পক্ষান্তরে সমতল জেলাগুলোতে কর্মরত জুম্ম চাকুরীজীবিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলীর ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি যে ছাড়পত্র নিতে হয় তা এখনো বাতিল করা হয়নি।

মন্ত্রণালয় ও ইহার উপদেষ্টা কমিটি গঠন

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৯নং ধারায় উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী; ২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ; ৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি; ৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি; ৮) সাংসদ, বান্দরবন; ৯) চাকমা রাজা; ১০) বোমাং রাজা; ১১) মং রাজা এবং ১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। এ ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয় গঠন ও মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উপদেষ্টা কমিটির তিনজন বাঙ্গালী সদস্যকে মনোনয়ন দেয়া হলেও পরিষদের কোন মিটিং অনুষ্ঠিত বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

বহিরাগত সেটেলার প্রত্যাহার

সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক চলাকালে ঐক্যমত্য হয় যে, সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটেলারদের রেশন প্রদান বন্ধ করা হবে, তাদের গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং উপযুক্ত অর্থ প্রদান করে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা হবে।

এছাড়া বাংলাদেশের সমতল জেলাগুলো থেকে বহিরাগত লোক এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে বসতি স্থাপন করতে না পারে এবং পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যাতে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা যেতে পারে তজ্জন্য চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আনা হয়--

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে ('ক' খণ্ডের ১নং ধারা)।

২। 'অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা'র সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে ('খ' খণ্ডের ৩নং ধারা)।

৩। তিন পার্বত্য জেলায় কেবলমাত্র তিনিই ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারবেন যিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁর বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করে থাকেন এবং

(৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন ('ঘ' খণ্ডের ৯নং ধারা)।

৪। সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত জুম্মদের জমিজমা প্রত্যর্পনের লক্ষ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠনের বিধান করা হয়েছে ('ঘ' খণ্ডের ৪নং ধারা) এবং কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ('ঘ' খণ্ডের ৬(খ)নং ধারা)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলারদের পুনর্বাসনের বিষয়টা যেহেতু অত্যন্ত স্পর্শকাতর তাই এ বিষয়টি সরাসরি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ না করে নানা কৌশলে ও নানা কায়দায় উল্লেখিত ধারাসমূহ আনা হয় যাতে সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত এবং জাল দলিলের মাধ্যমে বন্দোবস্তকৃত জমি অবৈধ বিধায় তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না এবং তিন পার্বত্য জেলায় ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারীও হতে পারে না, সর্বোপরি ল্যান্ড কমিশনের মাধ্যমে তাদের বেদখলকৃত জমিজমা জুম্মদের নিকট ফেরৎ যাবে তাই তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যথাযথ ও সম্মানজনক পুনর্বাসন ছাড়া কোন বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু সরকার চুক্তি এই মৌলিক স্পিরিটকে লংঘন করে সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নকে ব্যাহত করবে। অপরদিকে সেটেলারদের রেশন বন্ধ করা, গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ইহার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে পুনর্বাসন প্রাপ্তির আশায় সমতল জেলাগুলো থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

শেষ কথা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় অবনতি হয়েছে এবং দিন দিন উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। ইহার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, এতদাঞ্চলের বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ ও জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটেলারদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ ও চলমান ভোটার তালিকায় সেটেলারদেরকে অন্তর্ভূক্তিকরণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইহার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং তাদের দ্বারা ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে।

চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সমূহ হস্তান্তর না করা ও সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-কে কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে পাহাড়ী ও স্থায়ী বাঙ্গালীদের উপর জেলা ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জুলুম ও হয়রানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনাশাসন প্রত্যাহার না করার কারণে সামগ্রিক পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। পক্ষান্তরে এখনো আগের মতো জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। সেনাবাহিনীর গ্যারিসন স্থাপন, ক্যাম্প সম্প্রসারণ, বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোলান্দাজ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে জুম্মদের হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জুম্মদেরকে আগের স্বৈরাচারী সরকারের মতো ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার কার্যক্রম সমানে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের একটি সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহল চুক্তি বাস্তবায়ন বানচাল করার সকল প্রকার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ গোষ্ঠী একদিকে চুক্তি বিরোধীদের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য দিয়ে একাধারে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংস করা ও চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে সরকারী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বদৌলতে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে চুক্তি বিরোধীদের নানাভাবে নিরাপত্তা প্রদান করছে ও পক্ষান্তরে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ জুম্মদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৌলবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তথা জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার বিগত স্বৈরাচারী সরকারসমূহের ঘৃন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেটেলারদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তি ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের কার্যক্রম থেকে ইহা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল মুখে যাই বলুক আগেকার সেই নীতি অর্থাৎ জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার নীতি এখনো পরিত্যাগ করেনি। '৯৬ সনের নির্বাচনের বৈতরনী পার হওয়ার জন্য 'ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের অঙ্গীকার' করেছিল মাত্র।

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে বার বার দাবী করা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জাত্যাভিমানের উম্মাদনার বশে সংবিধানে আদিবাসী জুম্ম জনগণ তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগণের অধিকারের কথা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং হুমকি দিয়ে বলেছিলেন প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম এক লাখ, দুই লাখ, তিন লাখ, ...দশ লাখ বাঙ্গালী বসতি দেবেন। সে সময়কারের এই ঐতিহাসিক ভুলের জন্য বিগত আড়াই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্ত ঝরেছে এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি অর্থ, শ্রম ও শক্তি ক্ষয় হয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগও স্বয়ং চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গড়িমসি এবং চরম সুবিধাবাদী ও দালাল তিন এমপি-চক্রের মাধ্যমে নিলজ্জভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। তাই যদি হয় তাহলে সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে, আওয়ামী লীগ আরো একবার ভুল করতে বসেছে এবং এ ভুলের জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী থাকবে।

পরিশিষ্ট-১

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে জাতীয় সংসদে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮

১। চুক্তিঃ যেহেতু রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সমস্ত অঞ্চল চাকমা সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত ''রাঙ্গামাটি চাকমা চীফ'' এর পরিবর্তে ''চাকমা সার্কেলের চীফ এবং বোমাং সার্কেলের চীফ'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে ।

প্রণীত আইনঃ '২৬। পরিষদের সভায় চাকমা চীফ ও বোমাং চীফের যোগদানের অধিকার ইত্যাদি।- রাঙ্গামাটি চাকমা চীফ এবং বান্দরবন বোমাং চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন ।'

সংশোধন আবশ্যকঃ 'রাঙ্গামাটি চাকমা চীফ এবং বান্দরবন বোমাং চীফ' শব্দগুলি হতে 'রাঙ্গামাটি' এবং 'বান্দরবন' শব্দগুলি বাতিল করা ।

২। চুক্তিঃ ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে ।

প্রণীত আইনঃ '২১। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন- উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর--
(ক) উপধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে; যথা-

(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে এই ধারার উপধারা (১) এর আওতায় প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।

(খ) উপধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপধারা (৪) সংযোজিত হইবে; যথা-

(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।'

সংশোধন আবশ্যকঃ উক্ত আইনের ধারা ২১-এ বর্ণিত (ক) ও (খ) বাতিল করে যথাক্রমে নিম্নরূপে প্রণয়ন করা-
(ক) পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।
(খ) জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে ।

৩। চুক্তিঃ '৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ
ক) আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি সহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না ।'

প্রণীত আইনঃ '.....তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না ।
সংশোধন আবশ্যকঃ উল্লেখিত শর্তাংশে অবস্থিত 'সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সরকারের' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা ।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন-১৯৯৮-এ ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত অনুরূপ বিরোধাত্মক ধারা বিদ্যমান ।

বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন-১৯৯৮-এ ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত অনুরূপ বিরোধাত্মক ধারা বিদ্যমান ।

পরিশিষ্ট-২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে
স্মারকলিপি

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার,

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্মারক নং নিকম/স্থাঃনিঃ-১/জেঃপঃ/১(৫২)/৯২(অংশ-১)/৩৭৪ তারিখ- ২১শে মে,২০০০ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং পাচবিম(প-১)-নির্বাচন-২০/৯৬(অংশ-২)/২৩২(২০) তারিখ- ১১-১০-৯৯ইং এর পরিপ্রেক্ষীতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করা গেল --

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ প্রণয়ন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা বিশেষ শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় সংসদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচনের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি স্বতন্ত্র ভোটার তালিকা প্রণয়নকরন বিধিসম্মত।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ক' খন্ডের ১ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ''উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন''-- এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার -- ভোটাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত চুক্তির ৯ ধারায় এবং রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ১১ নম্বর ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক, অন্যূন আঠার বৎসর বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন ও পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা তিনি ভোটার তালিকাভূক্ত হইবেন। আর একই কারণে উক্ত চুক্তিতে ও আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অ-উপজাতি বাসিন্দা বলিতে যিনি উপজাতি নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝানো হইয়াছে। তাই এই আইন অনুসারে সকল নির্বাচনের জন্য একটামাত্র ভোটার তালিকা প্রণয়ন যুক্তিসঙ্গত।

৩। বিগত সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারী পরিকল্পনাধীনে সমগ্র দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে হাজার হাজার অ-উপজাতীয় লোককে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং বেসরকারীভাবেও শত শত অ-উপজাতীয় লোক ভূমি বেদখল করিয়া বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছে। ইহা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাবাহিনী, বিডিআর, ভিডিপি, এপিবি এর হাজার হাজার সদস্য নিয়োজিত রহিয়াছে। সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত শত শত অ-উপজাতীয় লোক চাকুরী ও অর্থনৈতিক সূত্রে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস করিতেছে। এসব অস্থায়ী কয়েক লক্ষ অ-উপজাতীয় লোককে যদি তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় ভোটার তালিকাভূক্ত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী হইবে এবং হাজার হাজার বহিরাগত সেটেলার ও অস্থায়ী অউপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের পথ প্রশস্ত হইবে। এজন্য এসব অস্থায়ী অউপজাতি সেটেলার ও অউপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকাভূক্তকরন বিধি বহির্ভূত ও অযৌক্তিক হইবে।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১১৯ ও ১২২ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২ এর বিধান বলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ১৫ই মে ২০০০ ইং হইতে সারাদেশ ব্যাপী যে নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু করা হইয়াছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এর প্রেক্ষাপটে সংবিধানের ১১৯ ও ১২২ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২ মোতাবেক নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়ন সঠিক নহে। বলাবাহুল্য পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ভোটাধিকার/ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিধান শুধুমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমিত না রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। অতএব তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইবে সেই একই ভোটার তালিকা জাতীয় সংসদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনেও ব্যবহৃত ও প্রযোজ্য হওয়া বিধিসঙ্গত।

৫। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের ২(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ এ বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত হইবার অধিকারী হইবেন যদি তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৮(১) ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে যিনি কোন ভোটার এলাকায় সচরাচর বা সাধারণতঃ বসবাস করেন তিনি সেই ভোটার এলাকার বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবেন। তবে কোন নির্বাচনী এলাকায় বসবাসরত সকল স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাকে ঐ নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হইতে হইবে সেই রকম কোন বিধান বা বাধ্যবাধকতা নাই। বরঞ্চ উক্ত অধ্যাদেশের ৮(২) ধারায় কেবলমাত্র আবেদন সাপেক্ষে ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে কার্যোপলক্ষে বসবাসরত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকা ভূক্ত করার বিধান রয়েছে। সুতরাং কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকার অনুরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নে কোন বাধা থাকিতে পারেনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ও উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ শাসন কাঠামোর আলোকে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সম্পূর্ন পৃথক। তাই ভোটাধিকার ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম স্বতন্ত্র হওয়া অপরিহার্য। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্নসূত্রে বসবাসরত অস্থায়ী অ-উপজাতীয়রা তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভূক্ত হইতে পারেন না।

৬। জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের জন্য একটা ভোটার তালিকা এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য অন্য একটা ভোটার তালিকা -- এই দুই ধরণের ভোটার তালিকা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রণয়ন করা হইয়া থাকে তাহা হইলে --

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্নভাবে লংঘন করা হইবে এবং উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইবে।

(২)উপজাতি ও স্থায়ী অ-উপজাতি বাসিন্দাদের ভোটাধিকার দ্বিখন্ডিত করা হইবে এবং তাহাদের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হইবে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগন তাহাদের পছন্দমত ও উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামো অস্বীকার করা হইবে এবং চুক্তি পরিপন্থী হইবে।

(৫) উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে না।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে এই সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করিতে পারে।

৭। অতএব উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় জনগনের স্বার্থে তথা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে অনতিবিলম্বে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণের জন্য জোর আবেদন করা গেল ---

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম স্থগিত রাখা।

(২) পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ১৭ নম্বর ধারার সাথে সঙ্গতি রাখিয়া রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সকল নির্বাচনের জন্য নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং এই নূতন ভোটার তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন স্থগিত রাখা।

(৩) যে যোগ্যতা ভিত্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইবে সেই একই ভোটার তালিকা যাহাতে জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ব্যবহৃত হইতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্বাচন বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান প্রনয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তারিখ ঃ- জুন, ২০০০ইং

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনগনের পক্ষে --

পরিশিষ্ট-৩

পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রদানকরণ এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পুনর্বাসন প্রদানের কার্যক্রম বাতিলকরণের নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট

স্মারকলিপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয়ের সমীপে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করা গেল যে --

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১ নম্বরে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু অর্থাৎ সংঘাতকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিধান রাখা হয়েছে। চুক্তির পরবর্তীতে উক্ত বিধান অনুযায়ী উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত করা হয় এবং উক্ত পুনর্গঠিত কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি হতে একজন করে মোট দুইজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২। ৬ই জুন ১৯৯৮ইং তারিখে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নিদিষ্টকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের ২৭শে জুন ১৯৯৮ইং তারিখের তৃতীয় সভায় আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক সংজ্ঞা নিম্নরূপে গৃহীত হয়- "১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট হতে ১৯৯২ সনের ১০ই আগষ্ট (অস্ত্র বিরতি শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবেন"।

৩। কিন্তু ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় সভায় অউপজাতীয়দের পুনর্বাসন বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে নিম্নরূপ বাক্য সংযোজন করা হয় - ''তবে যে সকল অউপজাতীয় ব্যক্তি উপরোক্ত সময়ে বিরাজিত পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি একই সাথে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হবে'' । উক্ত কার্যবিবরণী যথারীতি অনুমোদনার্থে ২০শে জুলাই ১৯৯৮ইং তারিখের চতুর্থ সভায় উত্থাপিত হলে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি শ্রী বকুল চন্দ্র চাকমা উক্ত সংযোজিত বাক্য বাতিলের দাবী জানান । অতঃপর ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ইং তারিখের পঞ্চম সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক টাস্ক ফোর্স এর নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ইং তারিখের এক আদেশপত্র পাঠ করে শোনানো হয় । উক্ত আদেশপত্রে বর্ণিত হয় যে --

''২৭শে জুন ১৯৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স সভার কার্যবিবরণীর তৃতীয় পৃষ্ঠার 'ক' সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নিদিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের কার্যপরিধি অনুসারে একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় ও অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের নিদিষ্টকরণ ও তাদের পুনর্বাসন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।''

এ আদেশপত্র প্রসঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক তীব্র আপত্তির কারণে সভায় বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং টাস্ক ফোর্সের সদস্য-সচিব এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক সরকারের বরাবরে প্রেরণ করার প্রস্তাব উঁথাপন করেন এবং উক্ত প্রস্তাবে সকলে সহমত পোষণ করেন । কিন্তু জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় কর্তৃক বার বার দাবী জানানো সত্ত্বেও উক্ত বিষয়ে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে টাস্ক ফোর্স অউপজাতীয় সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকে ।

৪। শেষ পর্যন্ত ২২শে নভেম্বর ১৯৯৯ইং খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত নবম সভা হতে বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিলের দাবীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় টাস্ক ফোর্সের সভা হতে ওয়াকআউট করেন এবং অউপজাতীয়দের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পুনর্বাসন কার্যক্রম বাতিল না করা পর্যন্ত টাস্ক ফোর্স সভায় যোগ দেবেন না বলে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যানকে জানান ।

৫। ১৫ই মে ২০০০ইং তারিখের একাদশ সভায় টাস্ক ফোর্স একতরফাভাবে উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও অউপজাতীয় সেটেলারদের তালিকা নির্দিষ্ট করে এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য ৪টি প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব গ্রহণ করে । টাস্ক ফোর্স কর্তৃক গৃহীত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা ও প্যাকেজ সুবিধা নিম্নরূপ ঃ

আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু--

জেলা	উপজাতীয় পরিবার	অউপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫,৫৯৫	৫,৫৯৫	৫১,১১১
বান্দরবন	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২
খাগড়াছড়ি	৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮,১৫৬	১,২৮,৩১৪

প্যাকেজ সুবিধা--

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০.০০ (পনর হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।
২) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে অস্ত্রবিরতির পূর্বদিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২ইং) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের--
   (ক) ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ রয়েছে তা সুদসহ মওকুফ করা যেতে পারে ।
   (খ) ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে ।
৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে ।
৪) আয়বর্ধন কমসূচীর জন্য একটি থোক বরাদ্ধ প্রদান করা যেতে পারে । উক্ত বরাদ্ধ হতে তফসীল ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা অত্যন্ত কম । উক্ত ধরণের সুবিধা দিয়ে কোন অবস্থাতেই উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবিত

প্যাকেজ সুবিধা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় পেশকৃত প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি হতে অনেক কম। নিম্নে উক্ত পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির বিবরণ দেয়া হল--

(ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা; (খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০.০০ টাকা প্রদান করা; (গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা; (ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবন প্রদান করা; (ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা; (চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা; (জ) চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা; (ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা; (ঞ) ঋণ মওকুফ করা; (ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা - ভূমি সমস্যা। এ ভূমি সমস্যার সাথে উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা এবং তাদের জায়গা-জমিসহ অবৈধভাবে দখলপূর্বক বসবাসরত বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও তাদের পুনর্বাসন সমস্যা সংযুক্ত। এ জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য চুক্তির পূর্বে সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতি পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অভিমতের ভিত্তিতে উক্ত আলোচনায় বিশেষতঃ বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি সূত্র নির্ধারিত হয়। উক্ত সমাধান সূত্রের অংশ হিসেবে ল্যান্ড কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি ফেরৎ প্রদান এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও তাদের পুনর্বাসন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি নির্ধারিত হয়েছিল। সুতরাং টাস্ক ফোর্স কর্তৃক উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি একইভাবে বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ অযৌক্তিক, অবান্তর ও চুক্তি পরিপন্থী।

৭। উপরোক্ত বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা নিরসন বিষয়ে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হল--

১. (ক) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ইং তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(খ) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

২. (ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

তারিখ ঃ জুন, ২০০০ইং

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনগণের পক্ষে--

চুক্তি বিরোধীদের প্রতি খোলা চিঠি

জীবন চাকমা

প্রয়াত প্রখ্যাত লেখক আক্তারুজ্জামান আমাদের প্রিয় ইলিয়াস ভাই একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা কি সত্যই বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করি কিনা। উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আবার বলেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তার তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে কিনা একটা অনুরোধ রোমান হরফ ব্যবহার না করে তাদের বাংলা হরফ ব্যবহার করতে হবে আমাদের ভাষার উন্নয়নের জন্য। কারণ দীর্ঘদিন বাংলার সাথে যে সম্পর্ক তার ভালো অনেক দিকও রয়েছে। উনি তখনো ঢাকা কলেজে পড়াতেন। মনে মনে বলেছিলাম ইলিয়াস ভাই সত্যি বলতে কি স্বাধীনতা কে না চায়। তবে সেই স্বাধীনতা সার্বভৌম নয় হয়তো। সেই স্বাধীনতা হলো অত্যাচার থেকে, ভূমি জবরদখল থেকে। সেই স্বাধীনতা জাতিগত নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা থেকে। বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বাস্তবতা নেই বলেই আমরা আপাততঃ বিচ্ছিন্নতার প্রত্যাশা করি না।

ভাবতে অবাক লাগে প্রসিত বাবুরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য মরনপণ লড়াইয়ে সদা ব্যস্ত। তাদের লড়াইয়ে মুখ্য শত্রু এখন জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পেতে হলে প্রথম আঘাত করতে হবে জেএসএস এর উপর এই হল তাদের রণনীতি। তাই ভাবতে অবাক লাগে কী হতে কী হলো। কিন্তু ভালো কথা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কেন স্বাধীনতাই বা কে না চায়। শক্তি, সামর্থ্য এবং সেই বাস্তবতা নেই বলে তো আজ এই আঞ্চলিক পরিষদ। তাছাড়া এই চুক্তির জন্য প্রসিত বাবুরাও যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তা কি তারা আদৌ ভেবেছে? সে কথায় পরে আসব। তার আগে বলা দরকার আঞ্চলিক পরিষদ বা আধাআধি স্বায়ত্তশাসন আমরাও চাই না। কথিত শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ জেএসএসও বলুক তারা এই আঞ্চলিক পরিষদ মনেপ্রাণে চেয়েছে কিনা। সাধারণ জনগণও নিশ্চয়ই চায়নি। কিন্তু তারপরও শান্তিচুক্তি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এখনকার সময়ের জন্য এটাই বাস্তবতা। প্রসিত বাবুরা কি ধরনের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায়- সেটা আদৌ পরিষ্কার নয়। তিনি কিন্তু জেএসএস এর পাঁচদফার সমর্থক। কেবল সমর্থক বললেও কম বলা হয়। জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জেএসএস এর সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেয়া তো তার জীবনের একমাত্র প্রতিজ্ঞা। আমরা যখন শান্তিবাহিনীতে না যাওয়ার কথা বলতাম তখন তারা কজন অবাক হয়ে যেতো। মনে হতো এটা কী রকম একটা অসম্ভব কথা বলে ফেললাম। শান্তিবাহিনী তথা সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেকে নিবেদিত রাখাটাই তখনকার সময়ে একমাত্র চাওয়া-পাওয়া। সে যাই হোক, মনে করতে হবে তার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন মানে জেএসএস এর পাঁচদফা। নাকি তার অন্য কোন ফর্মুলা আছে ? তাহলে সেটাই বা কী? সেটা যদি নতুন কিছু হয়ে থাকে তাও আমাদের জানা দরকার। তার বাস্তবতা কী তা জানলেও তো ক্ষতি নেই।

প্রসিত বাবুরা হয়তো তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি। আর তা হল - (১) তাদের এই আন্দোলন কেন? (২) তাদের এই আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? এবং (৩) তাদের এই আন্দোলন কাদের নিয়ে? উত্তরও বলে দেওয়া দরকার যদি না তারা জানেন। (১) এই আন্দোলন জুম্ম জনগণের অধিকারের (অধিকারের মাত্রা অনির্ধারিত - শান্তিচুক্তির আঞ্চলিক পরিষদও হতে পারে, আবার ৫ দফাও হতে পারে। এমনকি স্বাধীনতাও)। (২) এই আন্দোলন বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং (৩) এই আন্দোলন অবশ্যই জুম্ম জনগণকে নিয়ে। উত্তর যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে প্রসিত বাবুরা আপনারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। প্রথমতঃ বলতে হয় ৮৯ সালে যখন জনবিরোধী স্থানীয় সরকার পরিষদ হচ্ছিল সেই সময়ে ৪ঠা মে লংগদুর গণহত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ। যা আজ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নামে দ্বিখন্ডিত। তখন জেলা পরিষদ বাতিলের আন্দোলনে আপামর জনগণের ব্যাপক সমর্থন ছিল। বলা যেতে পারে তখন কেবলমাত্র ৯১ জন তখনকার সময়ের চামচা ছাড়া ইব্রাহিমের মত সেনাকর্তার সৃষ্ট ৯ দফা রূপরেখাকেও অন্য কেউ সমর্থন করেনি, বিশ্বাস করেনি। অথচ ভাবতে অবাক লাগে আমরা তা বাতিল করতে পারিনি। ৯০ এর গণ আন্দোলনের পর সর্বসম্মত সরকার প্রধান আজকের প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাঙ্গামাটি গিয়ে সবাইকে রীতিমত অবাক করে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই গণবিরোধী জেলা পরিষদ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে আসেন। শতকরা ৯৯ এরও বেশি লোকের প্রচন্ড বিরোধীতার মুখেও দিব্যি টিকে গেছে সেদিনের জেলা পরিষদ। আর আজকে কম করে হলেও ৯৯ শতাংশ মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থনে গড়ে উঠা আঞ্চলিক পরিষদ ভেঙে দেওয়া এবং জেএসএস খতম করার আন্দোলন কেবল হাস্যকরই নয়, রীতিমত বাড়াবাড়িও।

ধান ভানতে শিবের গীত না করে আসল কথায় আসা যাক। বলছিলাম প্রসিত বাবুদের আন্দোলন কেন। নিশ্চয়ই অধিকারের জন্য। সেই অধিকার কথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনও হতে পারে যদিও আজো জানি না সেই পূর্ন স্বায়ত্তশাসনের মানেটা কী। মাত্রাও বা কী তার। তবে এই কথা ধ্রুব সত্য যে, জুম্ম জনগণের আন্দোলন করার যে মাত্রায় ত্যাগের মানসিকতা সেই

মাত্রা দিয়ে এই আঞ্চলিক পরিষদ পাওয়া যায় মাত্র। এর বেশি আশা করা বৃথা। অপর দিকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও যেহেতু বাংলাদেশ সরকার তাই এই সরকার এইটুকুই দিতে পারে। এর বেশি নয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক পরিষদ পর্যন্ত। প্রসিত বাবুরা বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির কাছে যদি আঞ্চলিক পরিষদের চেয়েও বেশি কিছু আশা করেন তাহলে আমাদের কিছুই করার নেই। আর আওয়ামী লীগের থেকে তো আঞ্চলিক পরিষদ পাওয়াটাও যথেষ্ট। তবে প্রসিত বাবুরা নাকি গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নাকি যেন একটা আছে তার থেকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কামনা করেন। ভাবতে রীতিমত হাসি পায়। অবশ্য সেই দুরাশা প্রসিত বাবুরা করবে না বলেই বিশ্বাস। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর যেহেতু জুম্ম জনগণ কাজেই সেই জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ তো প্রসিত বাবুরা নিজেরাই। তাহলে আন্দোলন করে দেখুন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে। ভাল কিছু করতে পারুন তার শুভ কামনা করি। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বাদই দিলাম। আঞ্চলিক পরিষদের থেকে কিছু বেশি হলেও তথাস্তু। কিন্তু পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নামে ইদানিং যা করছেন তা আর যাই হোক ভাল বা নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল গোয়াতুর্মী দিয়ে নেতার কর্তৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা যায় না। এযাবত তার বিশুদ্ধ নেতৃত্ব কী দিতে পেরেছে? ছাত্র জীবনে প্রসিত যা করেছে তা হলো বিভেদ, ভাঙন, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠির জন্ম দেয়া। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্র পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত করার ক্ষেত্রে প্রসিত খীসা দায়ী। পরবর্তীতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদসহ গণ পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন দুই টুকরো হওয়ার পেছনেও প্রসিত খীসা নির্মমভাবে দায়ী। উনি থাকলে কথিত ইউপিডিএফও অনিবার্য খন্ডিত হবেই হবে। তার কথায় সত্য পৃথিবীতে একটাই। দুটো সত্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এবং তিনি যা ভাবেন, করেন একান্তই জুম্ম জনগণের জন্যই। এই সত্যের বিপরীতে সবই দালালী, স্বার্থবাদিতা ও মিথ্যা।

অতএব তার দেশপ্রেম, জাতপ্রেমই সাচ্চা। অন্যদের দেশপ্রেম-জাতপ্রেম থাকলেও নিখাদ নয়। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগ্রাম করতেই হবে। সে যদি খুনের রাজনীতিও হয়। সমাজের কোন অঙ্গ পচা থাকলে তার সমূলে উচ্ছেদ না করে উপায় নেই। যদিও তার মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। সেটা হলো মাথায় রোগ হলে তো আর মাথা কেটে বাদ দেয়া যায় না। জুম্ম সমাজে এক সময় ছিল গণ দুশমন জেলা পরিষদের চামচারা আমাদের জাতীয় শত্রু। তাই তাদের বিরুদ্ধে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে তাদের গায়ে মলমূত্র, থুথু, পচা ডিম ছুড়ে মারার গোপন সার্কুলার দিয়েছিলেন প্রসিত বাবু। কিন্তু এসবই ছিল মূল কর্মসূচী থেকে জনগণকে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের অপচেষ্টা মাত্র। এযাবত প্রসিত নেতৃত্ব যা দিয়েছে তা হল মুল কর্মসূচী বাদ দিয়ে দালাল খতম করার চারু মজুমদারের লাইন। ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মুল জাতীয় কমিটির ন্যায় প্রিয় কুমারকে গণ আদালতে বিচার করা থেকে শুরু করে চোর ধরে মাথা ন্যাড়া করে জুতোর মালা পরিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে শাস্তি দেওয়ার মত রোমান্টিক শুদ্ধি অভিযানের কর্মসূচীতে নিজে প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন প্রসিত বাবুরা। আজো তাই দেখছি। দালালি করা অবশ্যই ক্ষতিকর সামগ্রিক স্বার্থে। তবে দালালী না করেও প্রসিত বাবুরা যা করছেন তা কয়েক হাজার গুণ ভয়ানক। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রথম যেটা তারা চায় তা হচ্ছে জেএসএসকে নির্মূল করা। এটা রণকৌশল হতে পারে না। তাহলে কি এটা রণনীতি? যদি তাই হয় তাহলে এটা ধ্বংসের। এ নীতি না বদলালে সার্বিকভাবে পরিণতি খারাপ। কারণ জেএসএস আজ নিরস্ত্র হলেও তার উপর আঘাত আসলে তা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে বাধ্য। প্রয়োজনে মরিয়া হয়েও জেএসএস প্রতিরক্ষার্থে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবে। সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেলেও। কারণ মরতে কে চায়? সুতরাং যে জেএসএস এর আন্দোলনের গর্ভে আপনাদের জন্ম, যে জেএসএস এর নুনও খেয়েছেন বিস্তর সেই জেএসএস এর গুণ না হয় নাই বা গাইলেন অন্ততঃ তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কত বড় বেঈমানী তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। এর পরিনতিও কখনো শুভ হতেই পারে না। এ কোন সেলুকাস! নেমক হারাম আর কাকে বলে।

আজকের আঞ্চলিক পরিষদ বা কথিত শান্তি চুক্তির জন্য কেবল জেএসএস নয় প্রসিত বাবুরাও দায়ী। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা আর কী। আশি দশকের গোড়া থেকেই প্রসিত বাবুদের জেএসএস নৈতিক ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছে একথা কারোর অজানা নয়। বাইরে ছাত্র আন্দোলন দাঁড় করানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জেএসএস একান্তভাবে নিবেদিত ছিল। এই নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে আজকের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আন্দোলন। এমন এক সময় ছিল যখন প্রসিত বাবুদের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে অনেক কিছুরই সামাল দিয়েছে পার্টি। এমন কি প্রসিত বাবুদের নিরাপত্তার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করার টাকাও দিতে হয়েছে জেএসএসকেই। এসব ভাবতে লজ্জা হয় বৈকি। একেই বলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা। মূল কথা হল জেএসএস এর শুভেচ্ছা নিয়ে, তার কাঁধে ভর করে একটা বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার লালিত স্বপ্ন প্রসিত বাবুকে বরাবরই আচ্ছন্ন করে রাখত। কথায় কথায় আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার মিথ্যা বুলি, পার্টির প্রতি তার মিথ্যা আনুগত্য এবং পার্টির শুভেচ্ছা কাজে লাগিয়ে ছাত্রদের মাঝে নিজের অবস্থান পোক্ত করার চেষ্টা করে গেছে নীরবে নিভৃতে। তবে স্কুল জীবনেই গড়ে তুলেছিল আদর্শ যুব সংঘ। পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে তুলে পার্বত্য যুব ও ছাত্র সংহতি সংঘ নামের গোপন আঁখড়া। জেএসএস এর আর্থিক সহায়তায় এ আঁখড়ার জন্ম হলেও জেএসএস কোন দিন জানতে পারেনি এর গোপন কর্মসূচী। জেএসএস এর চোখে ধূলো দিয়ে একান্ত গোপনে গড়ে তোলা

এই সংঘ ক্রমে ক্রমে কিছু আত্মনিবেদিত ছাত্র কর্মীর জন্ম দেয় যারা পাহাড়ী ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এদের অনেকেই আজ আর প্রসিত বাবুর সাথে নেই। সাথে না থাকার একমাত্র কারণ প্রসিত বাবুকে মানতে না পারা নয়। বিভিন্ন কারণ আছে। প্রসিত অবশ্য প্রায়ই বলত সময় এলে গাছে অনেক ফুল ধরে কিন্তু সব ফুল ফলে পরিনত হয়না। খুবই সত্য কথা। তবে এখন দেখি সব ফুল ফলে পরিনত না হয় সত্য কিন্তু যেসব ফল হয়ও তার মধ্যে আবার পোকাক্রান্ত হলে যে কি ভয়ংকর হতে পারে তার জাজ্জ্বল্য উদাহরণ প্রসিত বাবু নিজেই। আর বেশী পেকে গেলেও মহাবিপদ। অর্থাৎ জাতপ্রেমের নেশাটা যদি মাতাল করে দেয় তার পরিণতিও মারাত্মক। প্রসিত বাবুরা এখন দুটোর যেকোন একটা। হয় আধাপাকা হয়ে রোগাক্রান্ত বা অতি ঝুনো ফলে পরিণত হয়ে পঁচে বসে আছেন। দুটোই আমাদের সমাজে এখন ভয়ানক পচন ধরাচ্ছে। আর না হলে খুনোখুনির মরণ খেলায় মেতে উঠবেই বা কেন তারা?

মূল কথায় ফিরে আসা যাক। পার্টি শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হওয়ার পেছনে প্রসিত বাবুরাও দায়ী বলেছিলাম। কিন্তু কেন? সম্ভবতঃ পার্টি পাঁচটি মৌলিক কারণে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে প্রথম তিনটি অভ্যন্তরীণ। পরের দুটি বাহ্যিক। (১) দলীয় বাস্তবতা। (২) সাধারণভাবে জুম্ম জনগণের দীর্ঘদিনের সংগ্রামে অবসাদগ্রস্ততা। (৩) ছাত্র-যুবকদের আন্ডারগ্রাউন্ডে সংগ্রাম করার অনীহা এবং রাজপথের আন্দোলনে মোহগ্রস্ততা। (৪) দেশের রাজনৈতিক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি এবং (৫) প্রতিবেশী দেশ ভারত ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি। এই লিডিং পাঁচটি কারণের মধ্যে প্রথম তিনটিই এখানে আলোচ্য। আজ হোক কাল হোক সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেকে সমর্পিত করার রক্তশপথ নিলেও প্রসিত বাবু নিজে কখনো জেএসএস এর সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার দৃঢ়তা দেখায়নি। তার সশস্ত্র সংগ্রাম কিভাবে, কার নেতৃত্বে সেকথা কোন কালেই খোলাখুলি বলেননি প্রসিত বাবু। কিন্তু দুর্ভাগ্য জেএসএস এর স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল এই ক্ষুদে উদীয়মান নেতা একদিন অবশ্যই সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেবে। তখনো তার উচ্চাভিলাষী চেহারাটা প্রকাশ পায়নি। জেএসএসই বা বলি কেন ? সাধারণ ছাত্র-যুবক কর্মীরাও মনে করত অন্য কেউ না গেলেও প্রসিত বাবু জেএসএস-এ যোগ দেবেই। ৯৩ সাল থেকে জেএসএস নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে পার্টিতে যোগ দেয়ার আহ্বান জানালে প্রসিত বাবু বরাবরই এড়িয়ে গেছেন। তার মতিগতি দেখে জেএসএস অবশেষে পার্টিতে অন্তর্ভূক্ত (পার্টিতে কেবল নাম লিখিয়ে) হয়ে বাইরে কাজ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানায়। প্রসিত বাবু তাও গোপনীয়তার অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে এড়িয়ে যান। ক্রমে প্রসিত বাবু নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে জেএসএস তখন ঠিক কী চাইছিল। এরপর থেকে তালবাহানা শুরু। পার্টির কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কাজ শুরু করতে থাকেন। গ্রামে গ্রামে তার মুরুব্বিয়ানা বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ বিচার-আচার থেকে শুরু করে ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আদলে তথাকথিত গণআদালত পর্যন্ত বসান প্রসিত বাবু নিজে। শান্তি আলোচনা চলাকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে যখন পার্টি দালালদের নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টায় জড়িত তখন প্রসিত বাবুরা দালালবিরোধী কর্মসূচী দিয়ে জেএসএস এর প্রতি দৃষ্টতা দেখাতে থাকে। ঘন ঘন অবরোধ, হরতাল ইত্যাদি কর্মসূচী দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টির পাঁয়তারা করতে থাকে। প্রিয় কুমারের মত ভিলেজ পলিটিশিয়ানের সাথে জেএসএস নেতার সাক্ষাৎ হওয়ার নিতান্তই মামূলী ঘটনাকে কেন্দ্র করে পার্টির সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি করে। পার্টির সাথে মতভিন্নতা দেখিয়ে পার্টির সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর সেই যে অপচেষ্টা এক পর্যায়ে এসে যখন রীতিমত শত্রুতায় পরিণত করে প্রসিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের রঙিন ফানুস উড়িয়ে জনগণকে নূতন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন নয়, স্বাধীনতার মোহে থাকলেও কারো কোন ক্ষতি বা আপত্তি নেই। আপত্তিটা তখনই যখন উনারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠায় জেএসএসকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে আঘাত আর হত্যার লীলা খেলায় মাতোয়ারা। দোহাই এই খেলা বন্ধ করুন প্রসিত বাবু। আপনার রাজনৈতিক জীবনে ক্যারিয়ারের জন্যেও তা মঙ্গল। কিছু জেএসএস বিরোধী মানুষকে নিয়ে খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণ আর জেএসএস খতম করার মাধ্যমে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন অর্জনের দিবাস্বপ্ন বাস্তবের মুখ তো দেখবেনই না বরং এই আন্দোলনে আপামর জনগণকেও পাওয়া যাবে না। জেএসএস এর অনেক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা তো গোড়াতেই ভুল করে বসে আছেন। শান্তি চুক্তি মানেন না ভালো কথা। আমরাও মানি না। কিন্তু জেলা পরিষদের সময়কার বিরোধিতার মত এই চুক্তি এবং জেএসএস বিরোধিতা করার বাস্তবতা এখন নেই। শান্তি চুক্তির সমর্থন না করেও জুম্ম জনগণের অধিকতর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখা যায়। জেএসএস বা শান্তি চুক্তি হয় আমলই দিলেন না কিন্তু তাতেও তো পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন-টাসন যাই বলুন সেই আন্দোলন জিইয়ে রাখা যেত। জনগণকে আজ হোক কাল হোক পাওয়া যেত। কারণ শান্তি চুক্তিতে আদৌ কারোর শান্তি নেই। চার লক্ষাধিক অনুপ্রবেশকারী আর শত সহস্র সেনাবাহিনীকে জায়গা দিয়ে কারোর শান্তিতে থাকার উপায় নেই। একথা জেএসএস চুক্তির আগেও বুঝতে পেরেছে পরেও তাই। আর এ কারণেই পার্টি তার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। শক্তি সামর্থ্য যা আছে তা দিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রসিত খীসার বাবা অনন্ত বিহারী খীসারও এখন মরণকালে হরিনাম। এই জ্ঞানপাপী ভদ্রলোকটি বলতেন জেএসএস মৃত ছেলে কোলে নিয়ে কান্নাকাটি করছে। অর্থাৎ জেএসএস এর আন্দোলন বৃথা।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে ছেলের সাথে উনিও ইদানিং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে সদা তৎপর। তা তিনি এখন কী নিয়ে কান্নাকাটি করতে বসলেন। মরা ছেলে নাকি মরে ভুত হয়ে যাওয়া ছেলে নিয়ে। কোনটা?

জেএসএস শান্তি চুক্তি করে জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে বললেও বলুন। কিন্তু তা আপনারা এতকাল কী কী করেছেন কীই বা করতে যাচ্ছেন। এ বি খীসারা তো এতকাল আন্দোলনে সক্রিয় না হয় হলেন না কিন্তু খুব বেশি সহযোগিতা তো করেননি। আন্দোলন প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন বটে কিন্তু সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতার কথা বাদ দিলাম সহমর্মিতাও তো দেখাতে পারেননি। বেছে নিয়েছিলেন একটা সাদামাটা একান্ত নিভৃত শিক্ষকতার জীবন। সুতরাং আন্দোলন থেকে বেশি কিছু আশা করেন কোন দুঃখে। বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে যথেষ্ট উদারতার প্রয়োজন। এসব লিখতে খুবই খারাপ লগছে। কিন্তু এ মুহূর্তে এসব বলা খুবই জরুরী। চিঠি পড়ে হয়তো ভাবতে পারেন ব্যক্তিগত আক্রমন হয়ে গেল। তা মনে করুন। কিন্তু এটাই সত্য। শান্তি চুক্তি সবার মত আমার জীবনেও তেমন কিছু আনতে পারেনি। কিন্তু শান্তি চুক্তির বিরোধিতা কেবল আমার নয় সমগ্র জুম্ম জাতীয় জীবনে অপরিসীম ক্ষতির কারণ হচ্ছে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আগে এর থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। নইলে ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরে যাবে। অর্থাৎ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দূরে থাক এই আঞ্চলিক পরিষদও হারাতে হবে। একে তো তিন জুম্ম এমপি নিয়ে জ্বালার শেষ নেই তার উপর ইউপিডিএফ এর উৎপাত। জনগণ কোনটা সইবে। জনগণের বন্ধু হতে হলে তাদের স্বার্থে কর্মসূচী ঠিক করুন। নিছক জেএসএস বিরোধীতাকে পুজি করে আন্দোলনের কোন ইতিবাচক দিক নেই। এই সত্যটাই আজ বুঝা উচিত। যেন তেন আন্দোলন নয়। জুম্ম জনগণের স্বার্থ নিয়ে রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর হওয়া চলে না। দুই যুগের সশস্ত্র সংগ্রাম যখন আঞ্চলিক পরিষদে মুখ থুবড়ে পড়েছে ঠিক সেই জায়গা থেকে গাদা বন্দুক দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবসম্মত তার বিস্তর সন্দেহ থেকে যায়। তবুও মানুষ আশা নিয়েই তো বাঁচে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে ক্ষতিইবা কি। আমরাও মনে প্রাণে সেই স্বপ্ন দেখতে কিংবা তারও বেশি আশা করি। জেএসএসও নিশ্চয় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (তা যদি আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সামান্যতম বেশি কিছু হয়) পেলে না করবে না। যদি তাই হয় তাহলে জেএসএস আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে থাকুক এবং প্রসিত বাবুরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত থাকুক তাহলেই হয়ে গেল। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রথম কাজটা যদি জেএসএস এর উপর আক্রমণ হয় বিপত্তি তখনই হয়। প্রসিত বাবু জুম্ম জনগণ আর আগের মত নেই। বিদ্যায় বিশ্লেষণে এখন অনেক অনেক অগ্রসর। তারা এখন অনেক জটিল এবং কূটিলও বটে। তাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বেশি বোকা বানানো যাবে না। গোটা বিশ্বটাই আজ বড়ই জটিল প্রক্রিয়াধীন। সমাজের চেহারাও বদলে গেছে। এ সময়ে অন্ততঃ আপনার নেতৃত্বে নতুন কিছু আশা করে না। আপনার ছেলে মানুষী নেতৃত্বে নির্ভর করা যায় না এটাই তাদের কাছে পরিষ্কার। জেএসএস যেখানে ৫ দফা নিয়ে আন্দোলন এবং আলোচনায় ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সময় তোমার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের (নয়া রূপকথার গল্প) ডাকের জেরে ব্যাপক অহেতুক আঘাত আর নানিয়ারচরে আপনারই গোয়াতুর্মির কারণে ঘটে যাওয়া ১৭ নভেম্বরের গণহত্যা আমাদের বার বার আপনার নেতৃত্ব সম্পর্কে সর্তক করে দেয়। অতএব বাস্তবসম্মত নীতি কৌশল ঠিক করুন। জনগণকে নেতৃত্ব দিতে হলে রোমান্টিকতা পরিহার করুন। শত্রু-মিত্রও চিহ্নিত করতে হবে। পরিষ্কার কর্মপদ্ধতি ঠিক করুন। কিন্তু দোহাই খুন খারাবির নেশায় যাতে না পেয়ে বসেন। খুন খুনের জন্ম দেয়। হত্যা হত্যার। বড় বেশি জাতপ্রেমিক হওয়াও ভয়ঙ্কর বিপদের। সময়টা খুবই খারাপ। এসবই আমার চাইতে আপনার বেশি জানা আছে। তবুও লিখলাম। কেবল মনের ঝাল মিটাতে নয়। প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে। না হলে নিজেও ডুববেন, জাতটাকেও ডুবাবেন। সময়টা বড় নিষ্ঠুর।

আজকাল আমাদের দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় দেশ ও জুম্ম জাতির প্রতিযোগিতায় নেমেছি - কাকে মেরে কে আগে জাতপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করবে সেটারই যেন কমপিটিশন চলছে। প্রসিত বাবুদের অবস্থা দেখে তাই কখনো ভাবি আমাদের দেশ-জাত সেবকের অভাব নেই। কেবল অভাব নেই বললেও বোধ হয় ভুল হবে। বলতে হবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কে আগে অবদান রাখতে পারে সেটাই যেন বড় হয়ে দাড়িয়েছে। অর্থাৎ অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সুনামের ভাগটা কেড়ে নেওয়ার জনেই তারা উদ্ধত। জাতপ্রেম থাকা খুবই ভাল কিন্তু তা যদি উগ্র জাতপ্রেম হয় তাহলেই বিপদ। আগে ছিল জেলা পরিষদে যারা ছিল এবং তাদের সাথে যারা যোগাযোগ রাখত সেই ছাত্র-যুবকরা দালাল। সেনাবাহিনীর সাথে যাদের যোগসাজশ ছিল তারাও দালাল। তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল প্রসিত বাবুরা। শান্তি চুক্তি করে জেএসএসও রাতারাতি দালাল হবে। জেএসএসও কেবল দালাল নয় বেঈমানও হয়ে গেছে নাকি। তবে তাদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু শান্তি চুক্তি নয়। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য জেএসএস। শান্তিচুক্তির অ আ ক খও পড়েনি। যাদের দালাল বলে তারা এযাবত চিহ্নিত করে আসছে তাদেরও ন্যূনতম জাতপ্রেম আছে। আর যারা নিজেদের বিশুদ্ধ জাতপ্রেমিক মনে করছে তাদের দেশপ্রেমও ১০০ ভাগ খাটি হতে পারে না। কিন্তু কথিত দালালদের নিশ্চিহ্ন করাই হচ্ছে বিশুদ্ধ জাত প্রেমিকদের প্রথম কাজ। এখানেই গৌণ হয়ে যাচ্ছে আসল শত্রুর সাথে সংগ্রামের দিকটা। দালালী সে যে মাপেরই হোক থাকবে চিরকাল। শারীরিকভাবে এই অস্তিত্ব ধ্বংস আজকের দিনের এই সমাজ

কাঠামোই একটি অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ তাই করবার চেষ্টা করছে শান্তিচুক্তির বিরোধীরা। পরিনামে যা হচ্ছে তা এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কল্পনা করতেও ভয় হয়। আজ ভ্রাতৃঘাতী যে তৎপরতা চলছে তা অনিবার্যভাবেই মূল আন্দোলনকে দুর্বল করবে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন দূরে থাক যা আছে যে অবস্থায় আছে তাও হারাতে হবে সে কথা আগেই বলেছি।

জেএসএস আর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের মধ্যে আপাততঃ দ্বন্দ্বটা যদিও শান্তি চুক্তির নামে অপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সমস্যা আসলে অন্যখানে। না হলে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলেও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের তেমন কীইবা ক্ষতি? কারণ তারা তো যেটা অপূর্ণ রয়ে গেছে সেটাই অর্জন করার জন্য লড়াই করছে। অন্যদিকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা হলে জেএসএস এরও কীই বা ক্ষতি? তাহলে তো দ্বন্দ্বটা অন্যখানে। প্রসিত নেতৃত্ব যা চায় তা হলো জেএসএস এর অধীনে নয় নিজেরই নেতৃত্বে একটি দল নিয়ে জুম্মদের অধিকতর অধিকার অর্জন করা। মূলতঃ জেএসএস এর যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক যোগ্যতা তার মনপূতঃ হয়নি কোন কালে। তার ধারণা হচ্ছে জেএসএস এর চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাও বাস্তব বিবর্জিত। যেমন দালাল বিশুদ্ধি অভিযান। দালালমুক্ত না করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায় সম্ভব নয়। অতএব দালাল নির্মূলই অধিকার অর্জনের প্রথম ধাপ। পথের কাঁটা সরিয়েই এগুতে হবে। দালালরাই পথের কাঁটা। কিন্তু অধিকার অর্জনে দালালদেরও পক্ষে আনার বা নিরপেক্ষ করার জেএসএস এর কৌশল তার সন্তোষজনক হয়নি। দালালদের সাথে কথাবার্তা বলা মানেই তাদের মতে আসকারা (তাদের ভাষায়) দেওয়া, তাদের সাথে মাখামাখি হওয়া। তাদের সাথে কথা বলা মানেই আপোষ করা। দালালদের সাথেও আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও প্রসিত নেতৃত্ব একটি মহান দায়িত্ব বলে মনে করে। অথচ সে যা চায়নি তাই করেছে জেএসএস প্রধান। অর্থাৎ তার কথামত জেএসএস চলেনি বলেই নাখোচ হয়ে যান উনি। সে থেকেই টালবাহানার শুরু। সুতরাং নিজের বিচার বিশ্লেষণ অনুযায়ী এগুতে চায় প্রসিত বাবুরা।

জুম্ম জনগণের এক বিরাট অংশ জেএসএস এর সমর্থক। এই অংশকে বাদ দিয়ে তো আর আন্দোলন এগিয়ে নেওয়া যায় না। তাই তাদের জেএসএস বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে হবে। যা কিছুই খারাপ জেএসএস এর ছিল বা আছে তা তুলে ধরতে হবে এবং সাথে সাথে জেএসএসকে নিশ্চিত করতে হবে। অতএব হত্যার লীলা খেলা খেলতেই হবে। তা না হলে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ক্ষতিকর দালাল এমপি দীপঙ্কর তালুকদার, এমপি বীর বাহাদুর ও মন্ত্রী কল্পবাবুর মত আরো কত দালালই তো দিব্যি তাদের ক্রিয়াকর্ম চালাচ্ছে। অথচ তাদের সাথে প্রসিতবাবুদের গভীর ভাবসাব আছে বলে তো শোনা যায়। আড়ালে আবডালে উনারা নাকি এখন কেবল অর্থ নয় অস্ত্রও যোগাচ্ছে। যে সময় প্রসিত বাবুরা প্রিয়কুমারদের সাজা দিয়ে যাচ্ছিল এবং যাদের বড় দালাল ভাবতেন সেই সময়ও তো আরো কতো বাঘা বাঘা দালাল বিনা বাধায় তাদের অপকীর্তি করেই যাচ্ছিল। অথচ চুনোপুটি প্রিয় কুমারকে নিয়ে প্রসিতবাবুরা মেতে উঠলেন কেন? কারণ একটাই। তা হলো তাদের একান্ত ব্যক্তিগত শত্রুতা। প্রিয় কুমারের সাথে কেবল প্রসিতবাবুর সম্পর্ক খারাপ ছিল তা নয় প্রসিতের বাবা বর্তমানে তুখোড় দেশ-জাত প্রেমিক এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপন্থী অনন্ত বিহারী খীসার ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভালো ছিল না। একই পাড়ার কাছাকাছি বলেই নয় বিভিন্ন সামাজিক কাজে নানা মতবিরোধে সৃষ্টি হয় তিক্ততা। প্রিয় কুমারও অত্যন্ত চালাক চতুর প্রকৃতির লোক জ্ঞানে অনন্ত বাবুর সাথে যেমন তার তুলনা হয় না অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিতে সামান্য ডিসি অফিসের কেরানী প্রিয় কুমার চাকমা অনন্তবাবুকে হার মানায় বটে। প্রসিতবাবু যতই অস্বীকার করুক না কেন তাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছিলই। আমাদের জন্য যেটা সবচে' দরকার সেটা হলো প্রকৃত জাতপ্রেম। জুম্মজাত নিয়ে তথাকথিত রাজনীতিকে নিছক পেশা বা নেশা করে সেবা করা যায় না। আর রাজনীতিটা তো প্রসিত বাবুদের একটা নেশা এবং পেশাও হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানিং। তাই ছাত্র পরিষদ, গণ পরিষদ বা জেএসএস সবকিছু বাদ দিয়ে মনগড়া একটা সংগঠন ইউপিডিএফ খুলে বসে আছে। তার এই ইউপিডিএফ সংগঠন করতে কজন জুম্ম জনগণ জানত? কজনকেই বা সম্পৃক্ত করতে পেরেছে প্রসিত বাবু? গুটিকয় ছাত্র যুবককে নিয়ে নানা নামে সংগঠন (দোকান) খুলে বসা যায় কিন্তু আপামর জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। তার এই সংগঠন নিয়ে কী স্বপ্ন আমার জানা নেই। তবে এই কথা পরিষ্কার যে, ব্যাপক মানুষের মনে তার কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষের স্বপ্নই আসল। তারা এই সময়ে কী চায়? কীই বা তাদের স্বপ্ন? তা তাদের আশা আকাংখা প্রসিতবাবুদের কি জানা আছে? কতিপয় জেএসএস বিরোধীকে নিয়ে চাঁদাবাজি করা যায়, জেএসএস-এর নেতা-কর্মীও খুন করা যায় বটে কিন্তু পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়। এটাও একটা সত্য। তবে আত্ম জিজ্ঞাসা বলে প্রসিত বাবুদের ডিকশনারীতে কোন কালে কোন শব্দ ছিল না। আর বারে বারে মার খাচ্ছে প্রসিত ঠিক এই জায়গাতে। নিজেদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে কোন সময়েই তার আত্ম বিশ্লেষণ নেই।

শান্তি চুক্তি করে জেএসএস যেমন মহান কিছু করে বসেনি তেমনি বড় কিছু খারাপওবা কী করেছে? যে আশা নিয়ে এতকাল অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে আন্দোলন করে এসেছে সে অনুযায়ী জেএসএস কিছুই এনে দিতে পারেনি এই শান্তি চুক্তিতে একথা হয়তো অনেকেই বলবেন। কিন্তু চুক্তি করে

জেএসএস জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে, জুম্ম জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছে বলে আজ যারা সোচ্চার জুম্ম জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অতীতে ও বর্তমানে অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে তাদের ভূমিকাটাই বা কী ছিল কী আছে তা জানতে ইচ্ছে হয়। আন্দোলনের সুফল তো তারাই ভোগ করেছে এতকাল। এতকাল তারাই যারা আজ জেএসএসকে তুলোধুনো করতে ব্যতিব্যস্ত। আজ যে জনগণ তিলে তিলে আন্দোলনের কারণে সীমাহীন অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেছে, চরম আত্মত্যাগ করেছে তারা তো জেএসএস এর উপর আজো আস্থা বিশ্বাস রেখে বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে এবং সামর্থ অনুযায়ী জেএসএস এর আন্দোলনে সক্রিয়। জেএসএস নেতৃত্বের কাছেই সঁপে দিয়েছে তাদের ভাগ্য। এই অতি সাধারণ নিরীহ মানুষদের এই অসাধারণ ভূমিকার মূল্য সত্যিই মহান। এতকাল আন্দোলনে তারা কেবল দিয়েছে। হারিয়েছে সর্বস্ব। আমরা তাদের কিছুই দিতে পারিনি। এই শান্তি চুক্তিও না। আন্দোলনের কানাকড়ি সুফলও তারা পায়নি। অথচ খুবই দুঃখজনক হলেও সত্য যারাই এই আন্দোলনে সুফল ভোগ করেছে কানায় কানায় তারাই জেএসএস বিরোধীতায় এক পায়ে খাড়া। নিজের কর্মীদের না খাইয়ে লক্ষ টাকা খরচ করে উন্নত চিকিৎসা দিয়ে জীবন যাদের বাঁচিয়েছে পার্টি, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, ছোট বড় অনেক চাকুরী (পিয়ন, কেরানী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত) বা ছোটখাট ব্যবসা সৃষ্টি করে দিয়েছে। দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার অসংখ্য বৃত্তি সবই তো আন্দোলনের ফল। মেম্বার, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে এমপি, মিনিস্টার হতে সাহায্য করেছে যে পার্টি সেই পার্টিকে আজ তারাই লাথি মারছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি কী হতে পারে? কথাগুলো খুব সহজ ভাষায় লিখছি বলে খারাপ লাগতে পারে কারো কারো।

যুক্তি তাদের অকাট্য। পার্টি জনগণের জন্য। কাজেই পার্টির টাকা মানেই জনগণের টাকা। সুতরাং জনগণের টাকা দিয়েই তারা যা করার করেছে। এতে পার্টির কাছে দায়বদ্ধতার কোন প্রশ্নই নেই। পার্টি নেতৃত্বের কাছে জ্বি হুজুর করে পার্টির বশ্যতা মেনে নিয়ে দুহাতে জনগণের শুভেচ্ছা আত্মসাৎ করেছে এসমস্ত ছদ্মবেশী ভদ্র সন্তানেরা। এভাবেই এযাবত কৃতঘ্ন ভদ্রলোকেরা পার পেয়ে গেছে। শুধু পার পেয়েই ক্ষান্ত নন তারা পার্টিকে ধ্বংস করার সব রকমের চক্রান্তে সক্রিয়। এই ন্যাক্কারজনক ভূমিকা তাদের কেবল চুক্তির পরে নয় চুক্তির আগেও ছিল। তাই কেবল প্রসিত, সঞ্চয় বা রবি শঙ্করদেরই বলি কেন খোদ পার্টির গুটিকয় কর্মী এবং ছাত্রও পার্টি নেতৃত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। শান্তি চুক্তির কিছুকাল অগেও প্রসিত বাবুরা পার্টির নিম্নস্তরের কর্মীদের মাঝে ভাঙন ধরাতে বান্দরবানের গহীন অরণ্যে গিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। এসব অপচেষ্টা ক্ষমার অযোগ্য। এরকম আরো অনেক অতি গোপন তথ্য জনগণ জানতে পারলে তাদের চরম মূল্য দিতে হবে বৈ কি! অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, তারাই আজ সমঝোতার গল্প শোনাচ্ছে। অতীতের জাতীয় শত্রুদের ন্যায় একদিকে যেমন অনাক্রমণ, ঐক্যফ্রন্ট ইত্যাদি চুক্তির প্রস্তাব দিচ্ছে অন্যদিকে জেএসএস নেতাকর্মীদের ধরে নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে এই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনকামী তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা। অন্যদিকে চুক্তিপক্ষ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই পাল্টা খুনোখুনির মরণখেলায় প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে যাচ্ছে স্বনামধন্য এমপি মহোদয়রা। এরই সুযোগ নিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে সামরিক-বেসামরিক কর্তৃপক্ষ আর সাধারণ প্রশাসনের সরাসরি সাহায্যে যার যার অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। আর সরকার তো চুক্তি বাস্তবায়ন না করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। এ মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বয়ং ভগবান হাজির হলেও তিক্ততার অবসান বা সহিংসতার কোন সুরাহা করতে পারবে না। কারণ যারাই সহিংসতা প্রশমনে ভূমিকা রাখতে পারত তারাই সক্রিয় মদদ নিয়ে যাচ্ছে প্রসিতচক্রকে। আর যাই কোথায়। জুম্ম জাতের ভাগ্য এভাবেই কি ঘুরপাক খাবে? সবার মনে এই প্রশ্ন গভীরভাবে নাড়া দিচ্ছে।

জেএসএস এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগটা প্রসিত বাবুর দীর্ঘদিনের ছিল। যখনি দেখা করতে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো তখন সম্মান, আন্তরিকতা, আদর, আপ্যায়নের কোন ত্রুটি থাকত না। ঢাকা বা চট্টগ্রাম যেখান থেকেই তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সর্ব প্রকার সামর্থ্য দিয়ে জীপ নতুবা কার ভাড়া করে রাজকীয় অতিথির মত করে নিয়ে যাওয়া হত। সুভাষ, সোহেল, যতনদের মত কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মীরা কতদিন যে নাওয়া খাওয়াহীন অবস্থায় দীর্ঘ নৌপথ ভররোদে পুড়ে, ঝড়ে ভিজে এইসব ছাত্রনেতাদের অভ্যর্থনা দিয়েছে তা যদি প্রসিতের অনুগামী বন্ধুরা স্বচক্ষে দেখত তাহলে বুঝত কী সম্মান তারা পার্টির কাছে পেত। নজিরবিহীন ব্যবস্থাপনায় এবং নিরাপত্তা দিয়ে ভেনুতে যখন তারা পৌঁছে যেত শীতকাল হলে গরম পানিতে স্নান করতে দেয়া হত। সার্বক্ষণিক নিয়োজিত হত পার্টিকর্মী তাদের সুবিধার জন্য। মুখ ধোয়ার পানি এমনকি পায়খানা করার সময় বদনায় পর্যন্ত পানি ভরে দিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। পার্টি প্রেসিডেন্ট শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের সকল ব্যবস্থাপনায় তদারকি করতেন। আর প্রতি সকাল বিকাল ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারে দুর্লভ সব খাবার পরিবেশন করে আপ্যায়ন করত পার্টিকর্মীর মা বোনেরা। অরণ্যের শুকর, হরিণ পর্যন্ত শিকার করে প্রসিত বাবুদের রুচিসম্মত খাবার যোগাড় করা হত। ঢাকা চট্টগ্রামের নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় যা যা প্রয়োজন টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান, তোয়ালে থেকে শুরু করে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হত তাদের জন্য যাতে তারা কষ্ট না পায়। নিজে কম খেয়ে, নিজের গরম কাপড় দিয়ে, নিজের মুশারী দিয়ে তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা করে দিত পার্টি কর্মীরা। তাদের প্রতি যে সম্মান আর সুযোগ

সুবিধা দেয়া হত তা পার্টির অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ের নেতা কর্মীও পেত না। আলোচনা শেষে ফিরে যাবার সময় হাতে তুলে দেয়া হতো প্রয়োজনীয় ফান্ড। ছাত্র পরিষদ, গণ পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং তাদের নিজস্ব নানা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে বাজেট তারা নিয়ে আসত প্রতিবারই সেই বাজেটের অধিক দেয়া হত।

নিখাদ এই আন্তরিকতার মধ্যে একটাই প্রত্যাশা ছিল যে, এই ছাত্রনেতারা জুম্ম জনগণের জন্য কাজ করছে, পার্টির জন্য কাজ করছে এবং একদিন পার্টিতে যোগ দেবে। এরাই পার্টির পরবর্তী কর্ণধার হবে। অথচ বাস্তবতার কি চরম পরিণতি অথচ এই বন্ধুরাই পার্টির নেতাকর্মীদের অপহরণ করছে, নির্মমভাবে হত্যা করছে। পার্টি আজ তাদের প্রধান শত্রু। অপরাধ একটাই। তা হলো শান্তি চুক্তি কেন করলো পার্টি। যুদ্ধ কেন করলো না পার্টি। যুদ্ধ কাকে নিয়ে করবে পার্টি? ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ পার্টি আকুল আহবান জানায় শিক্ষিত ছাত্র যুব সমাজের প্রতি সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার। তখন প্রসিত বাবুদের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে উঠে এক পর্যায়ে গতানুগতিক ধারায় ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে থাকে। সম্ভবত শতকার ২ ভাগ ছাত্রও যোগ দেয়নি পার্টিতে তখন। সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে কোন কালেই প্রসিত বাবুরা কাউকে উৎসাহিত করেনি। উল্টো ছাত্রযুবকদের রাজপথের মিছিলে, মিটিংয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করেছে। এর উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো ছাত্রযুবকদের মাঝে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং জেএসএসকে শক্তিশালী করতে না দেওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হয়নি। হয়েছে তার উল্টো। প্রসিত যেদিকে গেছে সেদিকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সংগঠন। ব্যাপক ছাত্রযুবকদের নেতাও হতে পারেনি প্রসিত। জননেতা তো দূরে থাক। আর যাই হোক জেএসএস এর বিকল্প হয়ে গড়ে উঠা কোন আঞ্চলিক সংগঠন অপাতত্তঃ নেই। ইউপিডিএফ তো নয়ই। অথচ এটাই আজ জরুরী। জেএসএস যদি কোন সময় দুর্বল হয়েও যায় জুম্ম জনগণের সামগ্রিক স্বার্থে জেএসএস এর ন্যায় একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম খুবই দরকার। এবং এ ভূমিকাটাই রাখতো পারত চুক্তি বিরোধী চক্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ, (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, খিয়াং, মুরুং ও চাক - এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদের পাহাড়ী বা জুম্ম বলি

- এম এন লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

মৃগাঙ্ক খীসা

১। বিগত ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাংলাদেশের শাসন কাঠামো তথা গণতন্ত্রায়নের পথে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী পাহাড়ী জনগণের ভূমির লড়াই-এর তথা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের পটভূমিতেই এ চুক্তির আত্মপ্রকাশ। একদিকে পাহাড়ী জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার অবসানে চুক্তি অনুযায়ী ঐতিহাসিকভাবে অধিকার অর্জনসহ পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্খা অন্যদিকে বর্তমান সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ তথা সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে পাহাড়ী জনগণের পক্ষে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্যবাসী ধারাবাহিকভাবে দাবী জানিয়ে আসলেও সাম্প্রতিক সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতি স্পষ্টতঃ দ্বিমুখী অবস্থানের ফলে পার্বত্য জনমনের আশংকা ও সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে চুক্তি বাস্তবায়নে মূল দায়িত্বরত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির দীর্ঘ দিনের নীরবতা ও টাস্কফোর্স চেয়ারম্যানের গণবিরোধী কার্যকলাপের ফলে সরকার পক্ষের চুক্তি লংঘন ও চুক্তির মৌলিক স্পিরিট থেকে সরে গিয়ে চুক্তিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চলছে। দীর্ঘ আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও চুক্তির মৌলিক দিকসমূহের বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমার লেখাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

সম্প্রতি বিগত ১৯-২৫শে জুলাই, ২০০০ইং পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির দু'জন শীর্ষনেতা উষাতন তালুকদার ও সুধাসিন্ধু খীসা-র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় গিয়েছিলেন। তারা ঢাকাস্থ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে মত বিনিময় করেন। আমি জনসংহতি সমিতির সফর দলের সদস্য হিসেবে তা প্রত্যক্ষ করি।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে অভিমত প্রকাশ করেন যে, পার্বত্যাঞ্চলের ভোটার তালিকা প্রণয়নে চুক্তি লংঘন, উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না করা, অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার না করা, ল্যান্ড কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি তথা উপজাতীয় জনগণের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে ৩৮,১৫৬ পরিবার সেটেলার পরিবার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের কথা অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত উল্লেখ করেন। চুক্তি নিয়ে ভবিষ্যতে কোন রূপ জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তজ্জন্য সরকারই দায়ী থাকবেন বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় সেটেলারদের অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধীতা করে পার্বত্যাঞ্চলে চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দা নিরূপনের পর স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবী জানান। উক্ত রূপ একটি মাত্র ভোটার তালিকা জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার দাবী জানান।

ঢাকায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সহ কোন কোন সংবাদ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদানকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পত্রিকায় আসেনি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক চুক্তি লংঘন পূর্বক সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তির আত্মীয়ের নামে জমি লীজ দেয়া। আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও বান্দরবানের ডিসি তা প্রত্যাখান করেন। ইতিপূর্বেও চুক্তিস্বোর সময়ে রাঙ্গামাটির প্রাক্তন ডিসি শাহ আলম ৪০ টিরও অধিক ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করেছিলেন। যা চুক্তি তথা চুক্তিমূলে প্রনীত আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়াও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ এখনো পর্যন্ত সংশোধন না করা, আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর করে রাখা, পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়াদি হস্তান্তরিত না করা, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক না হওয়া ইত্যাদি বিষয় বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে উল্লেখ করেন।

২. এখানে মূলতঃ পার্বত্যাঞ্চলের ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গ, জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যাবলী, ল্যান্ড কমিশনের ভূমিকার দিকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক) ভোটার তালিকা প্রসঙ্গেঃ

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সারা দেশে ভোটার তালিকা প্রণয়নের অংশ হিসেবে তিন পার্বত্য জেলার খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রায় সমাপ্ত। উক্ত ভোটার তালিকায় পার্বত্যাঞ্চলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পূর্নবাসিত সেটেলার বাঙালীদের অন্তর্ভুক্তিসহ হাজারে হাজারে সেনা বাহিনী, বিডিআর, ভিডিপি ও এপিবি সদস্যদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রাক্কালে জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ২২মে ২০০০ ইং ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের নিকট ভোটার তালিকা প্রণয়নের সমস্যাবলী

তুলে ধরেন। একই সাথে চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা অনুসারে ভোটার তালিকা করা যুক্তিসংগত বলে মত দেন এবং সেটেলার বাঙালীদের ভোটার তালিকা হতে বাদ দেওয়ার দাবী উত্থাপন করেন। এছাড়াও পার্বত্যাঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকেও দাবী উত্থাপন করা হয়। তার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জানায় যে, দেশে একটি মাত্র ভোটার তালিকা প্রযোজ্য হবে ও দেশের সকল অঞ্চলের নাগরিকগণ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূত হবেন। পরবর্তীতে পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য আলাদা ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার পক্ষের নেতারা যুক্তি দেখালেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকা শুধুমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বর্তমান ভোটার তালিকা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য এবং স্থানীয় পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধানের নির্বাচন সংক্রান্ত ১২১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে । সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয় ।

এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তির 'ক' খন্ডের (সাধারণ অংশের) ১নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, 'উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করিয়া এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন'। উল্লেখিত ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান ও উক্ত এলাকার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। একইভাবে চুক্তির 'খ' খন্ডের ৯নং ধারায় পূর্বোক্ত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ১৭ নং ধারার পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রতিস্থাপিত হয় - 'আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারবেন যদি তিনি - (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন'।

এখানে পার্থক্যটা হল পূর্বোক্ত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ১৭নং ধারা মূলে অনুসৃত ভোটার তালিকাটি জাতীয় সংসদসহ সকল স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তাই সে সময়ে ভোটার তালিকা বিষয়ে তেমন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। কারণ সে সময়ে পার্বত্য জনগণ '৮৯-এর স্থানীয় সরকার পরিষদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল । কিন্তু চুক্তি মূলে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন। স্বভাবতই পার্বত্য চুক্তি মূলে স্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটাধিকার উল্লেখযোগ্য দিক। আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

'অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।'

উপরোল্লিখিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, পার্বত্যাঞ্চলে চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান ও উক্ত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে - যা বাংলাদেশের কোথাও নেই। যদি সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্যাঞ্চলে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাহলে এ অঞ্চল বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হবে - যা পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা ক্ষুন্ন করবে। ফলে পার্বত্য চুক্তি লংঘন করাসহ পাহাড়ী ও স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দারা ন্যায্য ভোটাধিকার হারাবে। ভবিষ্যত জাতীয় পর্যায়ের গণপ্রতিনিধিত্বশীল পদে অংশগ্রহণের পথ রুদ্ধ হবে। কাজেই বাংলাদেশের শাসন কাঠামোর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে সুসংহত ও গণতান্ত্রিক করতে চুক্তি মূলে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা করাই কাম্য।

খ) পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পাহাড়ীদের ভূমি অধিকার/মালিকানা ও ল্যান্ড কমিশন প্রসঙ্গে

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডে ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ৯ই মার্চ, ১৯৯৭-এ আগরতলায় স্বাক্ষরিত ২০-দফা প্যাকেজ চুক্তির উল্লেখ রয়েছে। 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন'।

'ঘ' খণ্ডের ৩নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, 'জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যাণ্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যাণ্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইবে'।

উল্লেখিত ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পুর্নবাসন দুই ধরণের - একটি ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এবং অপরটি আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু। উপরোক্ত পুর্নবাসনের সাথে সাথে ভূমি জরিপ এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানার রেকর্ডভুক্তিসহ ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার শর্ত রয়েছে।

'ঘ' খণ্ডের ৪নং ধারা মতে জমি বিরোধ নিস্পত্তিসহ অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখলকৃত জায়গা জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলের পূর্ণ ক্ষমতা ল্যান্ড কমিশনকে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও ৮নং ধারা মতে যে সমস্ত অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমি ১০ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ না করে থাকলে তা বাতিলের শর্ত উল্লেখ রয়েছে। পর্যালোচনায় স্পষ্টতঃই উপজাতীয় জনগণের ভূমির অধিকার, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা বুঝা যায়। সেখানে কোথাও অউপজাতীয়দের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ নেই। অউপজাতীয়দের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়নি। উক্ত ধারাগুলো একটির সাথে অন্যটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং একটি অপরটির পরিপুরক। কিন্তু সরকার চুক্তি অনুযায়ী যথাযথ বাস্তবায়ন করছেনা। চুক্তি অনুযায়ী পুনর্বাসন ও ভূমি অধিকারের শর্ত ও ধারাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকার চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করে চুক্তি লংঘন করে গোঁজামিলভাবে তা করছেন। যা চুক্তিকে যথাযথ অনুসরণ করে নয় বরং চুক্তিকে নানান জটিলতার দিকে ধাবিত করছে।

যেমন বিএনপি আমলে ১৯৭৮ সালের দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটেলার বাঙালীরা জুম্ম জনগণের সিংহভাগ জমির উপর অবৈধ দখল করে আছে। যার ফলে জুম্ম শরণার্থীরা দেশে ফেরার পরও নিজ বাস্তুভিটায় যেতে পারছে না। সেই সেটেলারদেরকেই আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু করে টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার একতরফাভাবে উদ্বাস্তু তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

সেটেলারদের পুনর্বাসন করা হলে পাহাড়ীদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। পাহাড়ীদের প্রথাগত ভূমির অধিকার থাকবে না - যা পাহাড়ীদের অস্তিত্বের হুমকির স্বরূপ। সে কারণে পার্বত্য চুক্তির মূল স্পিরিটকে লক্ষ্য রেখে পাহাড়ী জনগণের ভূমির মালিকানা ও প্রথাগত ভূমির অধিকারের স্বার্থে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের যথাযথ স্বীকৃতি ও সমুন্নত রাখার জন্য বহিরাগত সেটেলারদের অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতল ভূমিতে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান বাঞ্চনীয়। ইতিপূর্বে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য অর্থ প্রদানের সুপারিশ করেছিল এবং তাতে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি ছিল। সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতল ভূমিতে পুনর্বাসনের যৌক্তিকতা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সরকার এখনো পর্যন্ত তা আমলে আনছেন না।

পার্বত্য সমস্যা চিহ্নিতকরন ও সমাধানের জন্য European parliament-এর রেজুলেশনে উল্লেখ ছিল নিম্নরূপঃ On Bangladesh, European parliment –23 October 1996 (Jointmotion For a Resolution –page-2)

Remarks: Add The remarks অংশে – "Part of the global aid to Bangladesh in for the repatriation of Bangali settlers in the Chittagong Hill Tracts (CHT) back to the Plains".

Justification অংশে - "One of the main human rights violations concerning the Chittagong Hill Tracts (CHT) people is Population Transfer of Bengali settlers coming from the plain into the Hill tracts, Which is main cause of conflict in the the region. The Bangladesh Government claims, it is willing to repatriate the Bengali setteler if Funds are provided".

এছাড়াও EAIP Newsletter, December 1996- এর (page-3) ছাপা হয় যে, "The European Parliament also reacted to the on going conflicts by adopting a modification of the budget line B7-3010: Economic Cooperation with Asian developing countries. In 1997 a certain amount of money under this budget line will be earmarked for the repatriation of Bengali settlers in the Chittagong Hill Tracts (CHT) back to the plains. Unfortunately an exact amount has not been mentioned in the amendments".

অথচ চুক্তি অনুযায়ী আগে ল্যান্ড কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের ভূমি মালিকানা ও অধিকার নিশ্চিত করা, চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দা নিরূপন করা, অবৈধ দখল, অধিগ্রহণ ও লীজ বাতিল করা, ভূমি জরিপের পর জুম্ম ভূমিহীনদের ২.০০ (দুই) একর করে প্রথম শ্রেণী জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা একান্ত জরুরী। এছাড়াও জুম্ম

শরণার্থী পুনর্বাসনে 'শরণার্থী কল্যাণ সমিতি'র ২৮শে ফেব্রুয়ারী'৯৯ রিপোর্টে দেখা যায় ৩,০৫৫ শরণার্থী পরিবার বাস্তুভিটা ফেরত পায়নি, ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি, ৪০টি উপজাতীয় গ্রাম ও ৭টি বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির সেটেলারদের দখলে রয়েছে। যা আজও বাস্তবায়ন করা হয়নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে, '৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবসতি বাঙালীরা যারা আজও পুনর্বাসিত হতে পারেনি তাদের বিষয়ে সরকার নির্বিকার। কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্বাস্তু পাহাড়ীরা বর্তমানে ভারতের অরুনাচল প্রদেশে ও বার্মায় দেশত্যাগী হিসেবে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পূনর্বাসনের ষড়যন্ত্র চলছে- যা অযৌক্তিক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরিপন্থী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে-

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরনার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রদান, বহিরাহত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন প্রদান, সেনাশাসন ও অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার, ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ও স্থায়ী-অস্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন তথা পার্বত্য চটগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামো কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম স্থগিত রাখা অপরিহার্য্য।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ১৭নং ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সকল নির্বাচনের জন্য নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং এই নতুন ভোটার তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, জাতীয় সংসদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয় এবং

৩। যে যোগ্যতার ভিত্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে সেই একই ভোটার তালিকা যাতে জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ব্যবহৃত হতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্বাচন বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

জনসংহতি সমিতি বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে না, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে

- সন্তু লারমা

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও 'জনদরদী' প্রসঙ্গে

মঙ্গল কুমার চাকমা

বান্দরবন পার্বত্য জেলা তথা পার্বত্য অঞ্চলে অবৈধভাবে জমি অধিগ্রহণ, লীজ ও বন্দোবস্তী প্রদানের বিরুদ্ধে গত ৩০ অক্টোবর বান্দরবন শহরের রাজবাড়ী মাঠে স্মরণকালের বিশাল একটি সমাবেশ হয়ে গেল। এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার প্রদত্ত ভাষণ, বিশেষতঃ 'আগেকার কর্মসূচী'র বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই সারা দেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষতঃ বান্দরবন পার্বত্য জেলার এমপি শ্রী বীর বাহাদুরের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অভাবনীয়। কারণ স্বয়ং তাঁর সম্মুখে এতবড় সমাবেশ, সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের ঢল। মানুষের ঢল এমনটিতেই নামেনি। বস্তুতঃ বিদ্যমান বাস্তবতা ও প্রাণের তাগিদ থেকেই হাজার হাজার মানুষের জোয়ার নেমেছিল। আরো উল্লেখ্য এ সমাবেশে কেবল জুম্মরা সমবেত হয়নি। বাংলা ভাষাভাষি স্থায়ী বাসিন্দারাও সমবেত হয়েছিলেন সমানে।

প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমাদের 'জনপ্রতিনিধি' এমপি বীর বাহাদুর একদম চোখের পলক না ফেলে ফ্যাল ফ্যাল করে বললেন - 'চুক্তির ৯৮ ভাগ ধারা উপধারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে'। এটাকেই বলে মিথ্যার বেসাতি। আমি জানি না বীর বাহাদুরের কাছে 'বাস্তবায়ন' বলতে কী বুঝানো হয়ে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সন্তু লারমাকে উদ্দেশ্য করে 'কোন জনদরদী নেতার মুখে এ ধরণের বক্তব্য মানায় না' বলেও তিনি 'জনদরদী'র একটা নতুন সংজ্ঞা উদ্ভাবন করে ফেলেছেন।

কেবল একটা উদাহরণ দিই। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির নিকট পাঠানো তথ্য মোতাবেক তিন বছরে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সরকার তরফ থেকে অবশ্য কখনো ৭১টি, কখনো ৬২টি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে বয়ান দেয়া হয়। তবুও তর্ক না করে ধরেই নিলাম বিগত তিন বছরে ৭১টি ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের 'জনপ্রতিনিধি'রা হিসেব করে দেখবেন কি পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ৭১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে যদি ৩ বছর সময় লাগে তাহলে পুরো পাঁচ শতাধিক ক্যাম্প সরিয়ে নিতে কত বছর সময় লাগতে পারে? সরকারী বয়ান মোতাবেক গড়ে বছরে ২৪টি ক্যাম্প প্রত্যাহৃত হলে তাহলে পাঁচশত ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে সময় প্রয়োজন হচ্ছে প্রায় ২১ বছর। আওয়ামী লীগের ভাষায় আরো কয়েকটি স্বৈরাচারী শাসনামল পার হতে হবে। অবশ্য এত সময় লাগারও কথা। আদিবাসী জুম্মদের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি না দেয়ায় ১৯৭২ সালে যে আওয়ামী লীগ ভুল করেছিল তার বুঝতে বোধহয় ২১ বছর থেকে বেশী সময় লেগেছিল। তারপরে তারা ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের 'অঙ্গীকার' করতে আরম্ভ করে। এখন তারা মনে করছে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের সেই 'অঙ্গীকার' পূরণ করে ফেলেছেন। তা আর বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তাদের মতে বোধহয় 'চুক্তি সম্পাদন'ই 'চুক্তি বাস্তবায়ন' হতে পারে। কারণ তাদের কাছে হয়তো ইংরেজী 'implementation' এর বাংলা অনুবাদ 'সম্পাদন' ও 'বাস্তবায়ন' দু'টাকেই বুঝানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল কারণ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বের সংকট। প্রথমটা হচ্ছে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ। এর ফলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসরত পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষি এগারটি আদিবাসী জুম্ম জাতি সত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই। অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস পেছন ফিরে দেখলে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তি সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম-অজুম্ম জনগোষ্ঠীর অনুপাত ছিল ৯৮.৫ ঃ ১.৫। আর আজ এর অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৫১ ঃ ৪৯। তাও আবার সরকারী তথ্য মোতাবেক। বাস্তবে প্রকৃত তথ্য আরো ভয়াবহ। চুক্তিতে স্থায়ী বাসিন্দার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত সেটেলারদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, সর্বোপরি চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত সেটেলারদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এই পরিস্থিতির আরো কি ভয়াবহ রূপ নেবে তা অনুমান করা কঠিন। এই মৌলিক ধারাটি বাস্তবায়ন বিষয়ে মাননীয় এমপি সাহেব অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা দেবেন কি?

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসা যাক। তা হল জন্মভূমির অস্তিত্ব। জন্মভূমি মানেই হচ্ছে মাটি বা ভূমি। কাগজেপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন দেশের এক-দশমাংশ। কিন্তু বাস্তবে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র বড়জোর ৬%। তাও আবার ৪০% কাপ্তাই বাঁধের নীচে তলিয়ে গেছে। তাহলে আর বাকী থাকেই বা কত অংশ। কর্ষণযোগ্য জমির অভাবে কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্তু ৮০% লোককে

পুনর্বাসন করা যায়নি। তবুও সরকার বিস্তীর্ণ জমির অজুহাত তুলে (প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন) চার লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করল। তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হল পরিবার প্রতি আবাদী জমি ২.৫ একর, বাম্পি ল্যান্ড ৪ একর ও গ্রোভ ল্যান্ড ৫ একর করে দেয়া হবে। বেচারারা এসে দেখে জমি কোথায়। সবখানে তো মালিক রয়েছে। ফলে তারা করল জুম্মদের জমি জবরদখল। এবার ভূমির উপর জুম্মদের দখল বা অধিকার চিন্তা করে দেখুন। মিথ্যার বেসাতি করে শাসকগোষ্ঠীর কেমন নিখুত হিসেব। ফলে ৬০ হাজারোধিক জুম্ম বিতাড়িত হয়ে পড়ে। তাদের বাধ্য হয়ে পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে হল। আর এক লক্ষাধিক জুম্ম পরিবার হল নিজ দেশে পরবাসী। যাদের আমরা সকলেই আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে চিনি। বিগত তিনটি বছরে এখনো আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি। তারা কীভাবে কোন অবস্থার ভিটেমাটিহীন ঠিকানাহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন মাননীয় এমপি সাহেব খবর রাখেন কি? ২০-দফা প্যাকেজ সুবিধা মোতাবেক ভারত থেকে জুম্ম শরণার্থী ফেরৎ আনা হল। ২০-দফার অনেক দফা বাস্তবায়িত হলেও ভূমি সংক্রান্ত মৌলিক দফাটি বাস্তবায়িত হল না। তারা টাকা পেয়েছে, কিছু সময়ের জন্য রেশনও পেয়েছে কিন্তু মূল ভূমিটা ফেরৎ পায়নি। ১২ হাজারের মতো প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারের মধ্যে ৩,০৫৫ পরিবার নিজ বাস্তুভিটা ও জমিজমা ফেরৎ পায়নি। গোটা চল্লিশেক গ্রামে তারা বসতি স্থাপন করতে পারেনি। সেসকল গ্রাম সেটেলারদের পূর্ণ দখলে। আরো রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। শরণার্থীদের ইতিমধ্যে রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটেলারদের যারা সেই আশি দশকের প্রাক্কাল থেকে রেশন পেয়ে আসছে তারা নির্বিঘ্নে ও অবাধে পেয়ে চলছে। মাননীয় এমপি সাহেব এবার বলুন আপনার ৯৮ ভাগ চুক্তি বাস্তবায়ন কোথায়?

মাননীয় এমপি সাহেব বলবেন কি এই দু'টো বিষয়ের মধ্যে কোনটা বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে। বিগত তিন বছরে বেদখলকৃত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ল্যান্ড কমিশনের কাজ শুরু হয়নি। (ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি তো অনেক দূরের ব্যাপার, কমিশনের কাজ কবে নাগাদ শুরু হতে পারবে একমাত্র 'উপরওয়ালা'য় জানেন)। জমি ফেরৎ পাওয়ার বা এই মৌলিক ইস্যু নিষ্পত্তির আশা কীভাবে করতে পারে বা কতদিন জুম্মদের সবুর সয়বে? উপরন্তু ২ লক্ষ ১৮ হাজার একর জমি থেকে বনায়নের নামে জুম্মদের উচ্ছেদ পরিকল্পনা। পাশাপাশি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে সেনাক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও স্থাপনের জন্য একা বান্দরবন জেলায় ৬৬ হাজার একর জমি অবৈধ অধিগ্রহণ। আর সমানে চলছে বহিরাগতদের জমি বেদখল, অস্থানীয় কাছে শত শত একর অবাধ ইজারা প্রদান ইত্যাদি।

জানি না মাননীয় এমপি সাহেব এ দু'টো মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন কীভাবে ব্যাখ্যা দেবেন। হয়তো বা সহজ সরল সরকারী ভাষা বলবেন - 'প্রক্রিয়া চলছে' বা 'প্রক্রিয়াধীন রয়েছে'। এই সরকারী ভাষা দিয়ে জনগণের মন ভরবে না, তয় সয়বে না। জনগণ সহজ সরল। তারা কথায় বিশ্বাস করে না। কাজে বিশ্বাস করে।

চুক্তি সম্পাদন করে একটা কাগজে দলিল তৈরী হয়েছে মাত্র। এটা বাস্তবে বাস্তবায়ন না করলে এটা কাগজই থেকে যাবে। জনসংহতি সমিতি কখনোই বলছে না সরকার কিছুই বাস্তবায়ন করেনি। করেছে অনেক। কিন্তু সবগুলো আধাআধি - যার মূল্য অর্থহীন। সন্তু লারমা তথা জনসংহতি সমিতির বক্তব্য হচ্ছে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর কিছুই সরকার বাস্তবায়ন করছে না। যেমন আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন, অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ল্যান্ড কমিশনের কার্যক্রম শুরুকরণ, ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান, জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সমূহ হস্তান্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকরকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য। আর এসব মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন না হলে অন্যান্য সকল ধারা উপধারার ৯৮ (?) ভাগ বাস্তবায়ন করে কোন অর্থবহ ফলোদয় হবে না। মূলে পানি না ঢেলে যদি কাণ্ডে ঢালা হয় তাহলে তা হবে জোচ্চুরী।

চুক্তি মোতাবেক আইন প্রণীত হয়েছে সত্যি কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই। প্রণীত আইন মোতাবেক বিগত দু'টো বছরে জেলা পরিষদে একটি বিষয়ও হস্তান্তর হয়নি। তাহলে আইন বানিয়ে লাভ কি? জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে পার্বত্য অঞ্চলের কোন ভূমি বন্দোবস্ত, ইজারা, অধিগ্রহণ ইত্যাদি করা যাবে না লিখে লাভটা কি যদি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সম্মান করা না হয়। মাননীয় এমপি সাহেবের নিজ জেলায় যদি জেলা প্রশাসক কর্তৃক শত শত একর জমি জেলা পরিষদের অগোচরে অধিগ্রহণ, ইজারা দেয়া সত্ত্বেও যদি বলেন চুক্তির সব ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে তাহলে চুক্তি বাস্তবায়নের সার্বিক পরিস্থিতিটা কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে তা সহজে অনুমান করা যায়। জানি না হয়তো সেই তস্কর জেলা প্রশাসকের মতো হয়তো বলবেন - এটা তো ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ক্ষমতাবলে আইন মোতাবেক করা হচ্ছে। কিন্তু তারা কখনোই বলার বা ব্যাখ্যা দেয়ার সৎ সাহস দেখাতে পারেন না - জেলা পরিষদ আইনে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি সহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। এই 'আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন'

লেখা হল কেন? এটা বলার বা ব্যাখ্যা করার সাহসী মনোবল তাদের নেই কারণ তাদের কাছে আইন, চুক্তি, অস্তিত্ব ইত্যাদি বড় নয়। তাদের কাছে বড় হচ্ছে ঢাকার অনুগ্রহ - নিখাঁদ দালালীপনা। আর তাদের কাছে এই নতজানু চারিত্রিক গুণই 'জনদরদী'র বৈশিষ্ট্য হিসেবে হিসেব করা হয় বলে মনে হয়। যাক হোক আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় এমপি সাহেবের এত প্রলাপ বকা শুরু হল কেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁর কাটা গাঁয়ে নুন লেগে গেছে বেশী। এজন্যই তিনি বেশী আস্ফালন শুরু করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ, ভূমি ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, নিজস্ব গণপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম তথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা ভিত্তি রচিত হয়েছে। তাই যথাযথভাবে যদি এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দারা তাদের সেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে না। বলাবাহুল্য, যেহেতু সরকার দীর্ঘ তিন বছরেও স্বাক্ষরিত চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে না। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্বে গৃহীত কর্মসূচী নতুন করে শুরু করার কথা ভাবতে হতে পারে - এটাই সন্তু লারমা তাঁর বক্তব্যে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বীর বাহাদুরের মতো তথাকথিত জনদরদী নেতা ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা এটাকে নানাভাবে অপব্যাখ্যা করে জনগনের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ব্যর্থ অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও জুম্মদের উপর সেই স্বৈরাচারী শাসনামলের ন্যায় জুলুম অবিচার নতুন করে শুরু হয়েছে - যা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জুম্মভূমির অস্তিত্বকে আরো ভয়াবহ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে - সেই বাস্তবতাকেই তাদের বুঝতে হবে। জুম্ম জনগণের এই বাস্তবতা ও প্রাণের তাগিদকে যদি আমাদের 'জনপ্রতিনিধি'রা তথা সরকার পক্ষ বুঝতে না পারে স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরেকটি নতুন পর্যায়ের দিকে ধাবিত হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সন্তু লারমা স্রেফ 'জনদরদী'র ভূমিকা নিয়ে এই 'আগের কর্মসূচী'র কথা বলেননি। এটা জুম্ম জনগণেরই প্রাণের কথা তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল মাত্র। □

আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি

- এম এন লারমা (সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণ)

একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা - রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথ প্রশস্থ করে দেওয়া হয়েছে

- এম এন লারমা (সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণ)

নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয় তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে

- এম এন লারমা

দেশের শোষণ ভিত্তিক অর্থনীতিকে ভেঙ্গে আস্তে আস্তে করে জনগণকে সম্পদের অধিকার দিতে হবে

- এম এন লারমা

যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সেই সংগ্রামের কথা ভূলে যাবেন না। সেই সংগ্রামের কথা যদি ভূলে যান, তাহলে ইতিহাস অপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস আইয়ুব খানকে, ইয়াহিয়া খানকে যে পথে নিয়ে গেছে, আপনাদেরকেও সেই একই পথে নিয়ে যাবে

- 'মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিষ্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪'

আমরা সর্বহারা আমাদের অহংকার করার কিছু নেই

- এম এন লারমা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১০ই নভেম্বর ২০০০ইং রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত